তিন্নির রোদ আর বৃষ্টি

চিত্তরঞ্জন মাইতি

বর্ণালী
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
কান্তি রঞ্জন ঘোষ
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রকাশ কাল :
মহালয়া—১৩৭০

প্রচ্ছদ :
স্বপন মণ্ডল

মুদ্রক :
সাধন চক্রবর্তী
নবীন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৩, ডাঃ কার্তিক বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

পরম প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত গণপতি মুখার্জী

ও

শ্রীমতী ছবি মুখার্জীকে

কয়েকটা দিন ভারি উত্তেজনায় কাটছে তিন্নির। চণ্ডিগড় থেকে জুলিয়েন আঙ্কেলের ছেলে তার দু'একটি মেডিক্যাল কলেজের বন্ধু নিয়ে মানালী আসছে। তাদেরই আপ্যায়নের পরিকল্পনায় কাটছে তিন্নির মুহূর্তগুলো।

মানালীতে ছুটি কাটানোর জন্যে ভাল হোটেলের অভাব নেই। জুলিয়েন বেননেরই তো দু'খানা ফার্স্ট ক্লাস হোটেল আছে। তারই তো একমাত্র ছেলে ক্যারল আসছে তার দু'তিনজন বন্ধু নিয়ে। দিব্যি কেটে যেত তাদের আপেল অর্চার্ডের ভেতর নিজেদের পেল্লাই বাড়িতে। সেখানে থাকতে না চাইলে হোটেলের স্যুইট আছে। কিন্তু জুলিয়েন আঙ্কেল সেদিক দিয়ে গেলেন না। তিনি তিন্নিকে ইশারায় কাছে ডেকে বললেন, মমি, পুরো একটা বছর পরে ক্যারল আসছে তার কয়েকজন বন্ধু নিয়ে। ওরা তোমার অতিথি হয়ে থাকুক, এটাই আমাদের ইচ্ছে। চিঠিতে যা জানিয়েছে তাতে মনে হয়, দিন দশেকের প্রোগ্রাম ওদের।

জুলিয়েন আঙ্কেলের পাশে তখন বসেছিলেন বালু আন্টি আর তিন্নির মা স্বয়ং।

তিন্নি বুঝে নিল এই তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর ভেতর ব্যাপারটা নিয়ে আগাম আলোচনা হয়ে গেছে।

তিন্নি স্বভাবে শান্ত গভীর। তার আবেগ কিংবা আনন্দ মনের ভেতরেই খেলা করে, উচ্ছ্বসিত হয়ে তা বাইরে ভেঙে পড়ে না।

আঙ্কেলের কথায় সে মিষ্টি হেসে মাথা নাড়ল।

প্ল্যান প্রোগ্রাম সবই কিন্তু তোমার।

তিন্নি বলল, আমি প্রোগ্রাম ছকে ওদের কাছে ফেলে দেব। তারপর সবাই মিলে আলোচনার পর ফাইন্যাল করা যাবে।

বেশ। টুয়েন্টি থার্ড এপ্রিল কিন্তু ওরা আসছে।

তিন্নি আবার মাথা নাড়ল।

তুমি, তোমার আন্টি কিংবা আমার সব রকম সাহায্যই পাবে। তোমার মা তো সব সময়েই তোমার সঙ্গে আছেন।

জুলিয়েন উঠে দাঁড়িয়ে অর্চার্ডের দিকে চলে গেলেন।

তিন্নি আর দাঁড়াল না। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে তার মনে।

সে দ্রুত চলে গেল তার নিজস্ব কোঠির দিকে।

ভ্যালির গা ঘেঁষে রাস্তার ওপর তিন্নির বাবা ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জী বিশাল বাড়ি তৈরী করেছিলেন। অবশ্য বাড়ির প্রায় তিনভাগই ছিল একটা নার্সিং হোম। গোটা বারো বেড, ডিসপেন-সারী, অপারেশন থিয়েটার। দুটি নার্স, চারটি আয়ার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। দারোয়ানের কোয়ার্টার বাগানের এক কোণে। সে তার ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। একটু দূরের থেকে রোজ আসেন কম্পাউণ্ডারবাবু তাঁর লালচে রঙের টাট্টুতে চড়ে।

মুখার্জী সাহেব মারা যাবার পর অপারেশান থিয়েটারের দরজা বন্ধ। কম্পাউণ্ডারবাবু কোনরকমে আউটডোরের কাজগুলো সামলে যাচ্ছেন।

জুলিয়েন বেনন ছিলেন ডাক্তার মুখার্জীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ডাক্তারী ডিগ্রি পাওয়ার পর পুষ্কর মুখার্জীর সুদূর হিমাচল প্রদেশে এসে ডাক্তারী ব্যবসা শুরু করার বিন্দুমাত্র কোন পরি-কল্পনাই ছিল না। কিন্তু হিমাচলবাসী এক সৎ মানুষের চিঠি পেয়ে তাঁকে কলকাতা থেকে কুলুতে চলে আসতে হয়েছিল। এই সৎ ও সুভদ্র মানুষটি ছিলেন অর্ণব মুখার্জীর ভবঘুরে ও খেয়ালী পিতৃদেবের আপেল অর্চার্ডের ম্যানেজার।

ছোটবেলায় মা মারা যান ডাক্তার মুখার্জীর। স্ত্রীর শোকে ডাক্তার মুখার্জীর বাবা এমনি উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েন যে তিনি শিশু-পুত্রটিকে তার মাসীর কাছে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। জীবিত থাকতে তিনি আর কখনো ছেলের কাছে ফিরে আসেননি।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি কুলু আর মানালীতে দুটি আপেল অর্চার্ড করেছিলেন। নরসিং লালজী ছিলেন সেই অর্চার্ড দুটির ম্যানেজার।

মালিক মুখার্জী সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি নিজে অর্চার্ড দুটি আত্মসাৎ না করে কলকাতায় মুখার্জী সাহেবের সদ্য ডাক্তারী পাশ করা ছেলেটিকে ডেকে আনেন। তার হাতেই তুলে দেন অর্চার্ড

দুটির ভার।

নরসিং লালজীর একটিমাত্র মেয়ে, ঝিন্নি। সে আর্টকলেজ থেকে সদ্য পাশ করে কুলু উপত্যকার নাগগরে রোয়েরিক আর্ট গ্যালারীতে একটা কাজ পেয়েছিল। আশ্চর্য কান্তিময়ী সেই কন্যাটির আকর্ষণে তরুণ ডাক্তার মুখার্জী মানালীতেই তার সাধনার আসন পাতল।

ডাক্তার মুখার্জী আর ঝিন্নির ভালবাসা একদিন বিপাশার স্রোতকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। পাইন অরণ্যে বাতাসের কানা-কানিতে শোনা যেত দুটি প্রেমিকের প্রায়-অস্ফুট প্রেমগুঞ্জন। ভোরের ছোঁয়ায় তুষার চূড়ায় লাগত তাদেরই হৃদয় থেকে ঝরে পড়া অনুরাগের রঙীন ফাগ। ওদের হাসি গানের সোনালী আলোয় ভরে গিয়েছিল কুলুর পথ প্রান্তর।

এই সময়গুলোতে ডাক্তার মুখার্জীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এক বলিষ্ঠ মনের মানুষ। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি ও ধর্মের এই যুবকটি যেমন হৃদয়বান, বন্ধুবৎসল তেমনি বোহেমিয়ান প্রকৃতির। এই জুলিয়েন বেননদের তিন পুরুষ কুলু ভ্যালিতে আপেল অর্চার্ডের সঙ্গে যুক্ত। কেবল ফল ব্যবসা নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁদের হোটেল ব্যবসাও।

জুলিয়েনের দাদু এবং জুলিয়েন এ দেশের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের মুক্ত মনে সংস্কারের লেশমাত্র ছিল না। জুলিয়েনের স্ত্রী বালু, কুলুবাসিনী এক রাজপুত কন্যা। তাঁদেরই একটি মাত্র সন্তান ক্যারল।

ডাক্তার মুখার্জী অকালে চলে যাওয়ায় মানবদরদী এই মানুষটির জন্য আজও মানালীর সমস্ত অধিবাসী শোক প্রকাশ করে। পাহাড়ীদের জীবনে এই শূন্যতা কে পূর্ণ করবে, সে নিয়ে আজও ঘরে ঘরে আলোচনার শেষ নেই।

আসলে অসহায় পাহাড়ীরা চায় অসুখের সময় একজন নিশ্চিন্ত অভয়দাতা। ডাক্তার মুখার্জী ছিলেন সে রকম একজন দেবদূত যিনি কাতর মানুষের ব্যথার তরঙ্গ দূর থেকেই অনুভব করতে পারতেন। কখনো সখনো দেখা যেত একটি টাট্টু ঘোড়ায় সওয়ার

হয়ে তিনি চলেছেন পাহাড়ী পথে। মানুষজন ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁকে নত হয়ে নমস্কার করছে। তিনিও তাদের রোগ ব্যাধির খোঁজ খবর নিচ্ছেন। দরকারে তাঁর প্রায়-দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়ে ওষুধ আনতে বলছেন।

বছর দুয়েক আগে ওপারের পাহাড়ী টিলা থেকে একটা অ্যাবনর্মাল ক্রিটিক্যাল ডেলিভারী কেস অ্যাটেণ্ড করে ফিরছিলেন। রাত একটা, চাঁদের দুধসাদা জলে ধোয়া ভ্যালি। ফিরছিলেন একাই। যত রাতই হোক, সঙ্গে কাউকে নিতে চাইতেন না। হঠাৎ টাট্টু থেকে কি করে যেন নিচে পড়ে গেলেন।

ভোর হয়ে গেল তবু ডাক্তার মুখার্জী বাড়ি ফিরছেন না দেখে উদ্বিগ্ন ঝিন্নি দেবী স্বামীর অভিন্নহৃদয় বন্ধু জুলিয়েন সাহেবের কাছে খবর পাঠালেন।

জুলিয়েন অমনি ছুটলেন বন্ধুর খোঁজে। যখন ফিরলেন তখন দেখা গেল, ডাক্তার মুখার্জীর প্রাণশূন্য দেহখানা লুটিয়ে পড়ে আছে বন্ধুর কাঁধের ওপর।

খবরটা কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। কাতারে কাতারে মানুষ তাদের প্রিয় ডাক্তার সাহেবকে দেখার জন্য বন্যার মত আছড়ে পড়তে লাগল হসপিটাল চত্তরে।

সেই বেদনার দিনগুলো আজও বড় ভারাক্রান্ত করে রেখেছে ডাক্তার মুখার্জীর প্রিয়জনদের স্মৃতি।

সেদিনের ছোট্ট অথচ বড় উজ্জ্বল একটুকরো ঘটনা আজও গাঁথা হয়ে আছে তিন্নির মনের গভীরে।

বাবার সুন্দর দেহখানা শোয়ানো আছে বাড়ির সামনে বিশাল লনে। ফুলেফুলে ছেয়ে গেছে দেহ। সারি দিয়ে পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষ চোখের জলে তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছে।

মা আর বালু আন্টি শবদেহের শিয়রে বসে আছে দুটি পাথরের পলকহীন স্থির মূর্তির মত। জুলিয়েন আংকেল সমারোহ-পূর্ণ শেষযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত।

একটা পিলারের আড়ালে একা দাঁড়িয়েছিল তিন্নি। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল তার জলের ফোঁটাগুলো। ভিড়ের ভেতর

থেকে সে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল একান্ত নির্জন এই জায়গাটিতে।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন এসে তার একটা হাত ধরল।

পেছনে ফিরে দাঁড়াল তিন্নি।

ক্যারল!

ভারী গলায় ক্যারল জানাল, আমি ডাক্তারী পড়ব স্থির করে ফেলেছি তিন্নি।

অবাক হয়ে তিন্নি বলল, তুমি না বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ঢুকবে বলে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছ।

এই মুহূর্তে সব বাতিল করে দিলাম। চণ্ডিগড়েও আমি সিলেক্টেড হয়ে আছি।

কিন্তু কেন?

দেখছ না আংকেলের জন্য মানুষগুলোর কি শোক। আংকেল চলে গেলেন, ওদের দেখবে কে?

তিন্নি সেদিন এতবড় শোক ভুলে উচ্ছ্বাসে বলে উঠেছিল, সত্যি ক্যারল, তুমি আমার ড্যাডির মত ডাক্তার হবে!

ডাক্তার আংকেলের সেরকম ইচ্ছে ছিল তিন্নি। তিনি আমাকে বার বার বলতেন।

সেদিন এতখানি শোকের ভেতরেও উত্তেজনায় ক্যারলের হাতখানা চেপে ধরেছিল পঞ্চদশী তিন্নি।

সেদিনের সেই একান্ত নিভৃতে দেওয়া কথাটির মর্যাদা রেখেছে ক্যারল। সে আজ দুবছর হল ডাক্তারী পড়ছে চণ্ডিগড়ে। বাড়ি আসতে চায় না বড় একটা। তবে প্রতিমাসে নিয়ম করে একটি চিঠি পাঠায় তিন্নির নামে। এ দুবছরে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

কিন্তু আশ্চর্য, এই কয়েকদিনের ছুটির কথা তিন্নিকে আভাসেও জানায়নি ক্যারল। সম্ভবত হঠাৎ এসে দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেবে এই ছিল তার উদ্দেশ্য।

তিন্নিদের বাড়ির সংলগ্ন পাহাড়ের একটা অংশ প্রকৃতির খেয়ালে অনেকখানি ঝুঁকে আছে গভীর একটা কড়ার মত ভ্যালির দিকে।

পাহাড়ে নিবিড় ঘন অরণ্য-বৃক্ষের সমাবেশ। সেখানে সরকারী অথবা বেসরকারী কোন বাড়ি নেই।

ঝিনিদেবীর আগ্রহে একসময় ডাক্তার মুখার্জী অনেক তদ্বির করে ভ্যালির দিকে ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের ঐ অংশটিতে একটি কুঠি তৈরীর অনুমতি পান।

অপূর্ব কাচের গোল একখানি বড় ঘর। সামনে ছোট্ট লন। ফুলের কেয়ারী। লনের মাঝখানে তিনটি ঘন পাতায় ছাওয়া পাইন গাছ দাঁড়িয়ে। ঘরের গা জুড়ে থোকায় থোকায় ঝুলে আছে লতানে গোলাপ। লালে সাদায় ভারি দৃষ্টি-নন্দন।

ঝিনিদেবী নামকরা শিল্পী। ঐ ঘরে বসে তিনি তাঁর শিল্প-সাধনা করতেন। এখন তিনুনির দখলে এসেছে ঐ ঘরখানা। কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মায়ের কাছ থেকে পাঠ নেয় ছবি আঁকার।

ঝিনিদেবী যৌবনে একবার ফ্রান্সে গিয়ে চিত্র-শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় তিনুনিকে বিদেশে পাঠিয়ে তাঁর অপূর্ণ ইচ্ছেটা পূর্ণ করেন।

তিনুনি পাহাড়ে উঠে এখন তার ছবিঘরে ঢুকেছে। গেস্টদের নিয়ে সে তার পরিকল্পনার ছক তৈরী করবে এখন। দায়িত্বটা কম নয়। এটা তার কাছে বিশেষ ধরনের একটা পরীক্ষা। সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে হবে এ পরীক্ষায়।

কোথায় অতিথিদের রাখা হবে, খাবার মেনু কি হবে, দর্শনীয় কোন্ কোন্ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে এই কদিনে, ছোটখাটো কি উপহার দেওয়া যায় তাদের, এইসব নানান ভাবনা মৌমাছির গুঞ্জনের মত বেজে চলেছে তার মাথায়।

সবকিছু ভাবনার ভেতরে সূক্ষ্ম অভিমানের একটা করুণ গন্ধ মাঝে মাঝে তাকে উদাস করে তুলছিল। ক্যারল তাকে একটি কথাও জানায়নি। চিঠি এসেছে বারো দিন আগে, তাতে অনেক কথা আছে, নেই কেবল তার আসার সামান্যতম খবর।

এটা কি শুধুই সারপ্রাইজ? ক্যারল কি জানে না, জুলিয়েন

আঙ্কেলকে চিঠি দিলে তা গোপন থাকবে না। তা সে যত ছোট খবরই হোক। আঙ্কেল হাহা করে হেসে যেমন হাওয়ায় হাসি ছড়িয়ে দেন, তেমনি খবরগুলোকেও চেপে না রেখে উড়িয়ে দেন আকাশে। আসলে মানুষটির ভেতর গোপনতা বলে কিছু নেই।

বার বার সুষ্ঠু একটা প্ল্যান ছকতে বসছে তিনানি, কিন্তু এই সব বুদবুদের মত জেগে ওঠা চিন্তায় তা ভেস্তে যাচ্ছে।

ভ্যালির ওপারে ঝলমল করছে তুষার চূড়াগুলো। নিচে বাঁকা তলোয়ারের মত ঝিলিক মেরে বইছে একটা পাহাড়ী নদী। মার্চের শেষ সপ্তাহ। চারদিকে পাহাড়ের গায়ে বরফের ধবধবে যে চাদর জড়ানো ছিল তা এখন ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। আপেল গাছে শুরু হয়েছে সাদা আর গোলাপী ফুলের মরসুম।

বন্ধুদের জন্য প্ল্যান তৈরী করতে গিয়ে বসন্তের ছবি দেখতে লাগল তিনানি।

ঐ তো একপাল ভেড়া সবুজ বনের পথে আঁকাবাঁকা ঝর্ণার ঢেউ তুলে নিচের দিকে নেমে চলেছে। তাদের পেছনে একজোড়া গাদ্দী পহাল। মেষচারকদের টিপিক্যাল পোশাকে তাদের মানিয়েছে চমৎকার।

প্ল্যান তৈরী মাথায় উঠল তিনানির। সে কার্ড নিয়ে অতিথিদের উপহার দেবার জন্য ছবি আঁকতে বসে গেল।

পাইন গাছের পাশ দিয়ে ভেড়ার পাল নিয়ে নামছে একটি গাদ্দী পহাল। তার পেছনে তার তরুণী বউ। সুন্দর কুলুর তৈরী টুপি মাথায়। কোলে দুধসাদা একটা ভেড়ার বাচ্চা।

ছবিখানা এঁকে ভারি খুশী হয়ে উঠল তিনানি। নিজের হাতে আঁকা তরুণী বউটিকে বার বার দেখছে আর রোমাঞ্চ জাগছে সারা শরীরে। ষোলটি বসন্ত পার হয়ে এসে তিনানি এখন সপ্তদশী।

আরও একখানা ছবি এঁকে ফেলল সে।

ফুলন্ত আপেলের ডাল। একটি ঝুটিওলা বাহারী রঙের পাখি বসে আছে সেই ডালে। নিচের সরু শাখাটিতে বসে আছে পক্ষিণী, তার দোসরটিকে দেখছে মুগ্ধ চোখে।

এবার তার মনে হল, এই দু'খানা ছবিতে মনের কথা খুব বেশী

করে মেলে ধরা হয়েছে। গোপন মনের গভীরে যা থাকে তাকে দিনের আলোয় তুলে আনলে কি বড় বেশী প্রকাশ হয়ে পড়ে না? গোপন ভাবনার একটা আলাদা সুগন্ধ আছে।

এবার সে বিষয় বদল করল।

দুই তীরে ছোট বড় শিলাস্তূপ। তাদের ফাঁকে ফাঁকে উঠেছে সতেজ সবুজ পাইন গাছ। মাঝ দিয়ে বইছে নীলাম্বরী বিপাশা।

এখানেও মনে হল, অনেকগুলি পুরুষ আবেগে উচ্ছল একটি নারীকে দেখছে।

তার চতুর্থ চিত্রটি তুষার পাহাড়কে নিয়ে।

নীল আকাশের গায়ে বরফের মুকুট পরা পর্বত। চূড়ায় তার লেগেছে সকালবেলার সোনালী আলোর ছোঁয়া।

শেষ ছবিখানা আঁকতেই সন্ধ্যের ধূপছায়া দেখা দিল।

স্কেচ শেষ হয়ে গিয়েছিল, টুক্ করে আলোর সুইচ টিপল তিন্নি। অমনি ঝলমল করে উঠল কাচের ঘর। আলোয় রঙের কাজ শেষ করতে হবে।

ঝিন্নিদেবী নিচের ঘরের জানলা থেকে দেখলেন, ছবিঘর আলোর বন্যায় ভাসছে। শৌখীন বেলোয়ারী ঝাড় থেকে সাত রঙের স্রোত সৃষ্টি করছে অলৌকিক ইন্দ্রধনু। দূর থেকে দেখলে দৃশ্যটা ভারি চমকপ্রদ মনে হয়।

ঝিন্নিদেবী ভাগ্তু, ভাগ্তু বলে ডাক পাড়তে লাগলেন।

ক্রাচে ভর দিয়ে তিরিশ বছরের যুবক ভাগ্তু এসে দাঁড়াল।

ঝিন্নিদেবী কাতর গলায় বললেন, হাঁরে বাবা, তিন্নি তো এখনও নামল না। সেই কখন দুপুরের খাওয়া খেয়েছে, চায়ের টেবিলেও হাজির হল না।

ভাগ্তুরাম বলল, তাহলে আমাকে কি করতে হবে বলে ফেল।

ঝিন্নিদেবীর গলায় সংকোচের সুর, তুই আবার এই ভর সন্ধ্যেয় খাবার নিয়ে ছবিঘরে উঠবি?

তাই তো তোমার ইচ্ছে। আমি বুঝি না, তিন্নিকে তুমি সবচেয়ে বেশী ভালবাস।

তোকে বাসি না বুঝি?

ভাগ্‌তু এর কোন জবাব না দিয়ে বলল, কি দেবে, আমার ঝোলায় ভরে দাও। ঐ জঙ্গলের রাস্তায় একটা বালব আবার কদিন ধরে জ্বলছে না।

উদ্বিগ্ন ঝিন্নিদেবী বললেন, তাহলে তুই বাবা বুঝিয়ে সুঝিয়ে বোনকে সঙ্গে করে আনিস।

যদি এখুনি নামতে না চায়?

তুই একটু বসে থাকবি। মোট কথা, তোর সঙ্গে যেন ও নেমে আসে।

ভাগ্‌তুরাম কাঁধের ঝোলায় খাবারের প্যাকেট আর চা ভর্তি ফ্লাস্কখানা ভরে নিয়ে ক্রাচ বগলে বেরিয়ে গেল।

ঝিন্নিদেবী তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফেলে আসা অতীতে ডুবে গেলেন।

এই সেই ভাগ্‌তুরাম। গান্দী পহ্লাদের দশ বার বছরের ছেলেটি। বাপ মায়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো ভেড়্ বক্‌রি চরিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে। ভারি মিষ্টি ছেলেটা। কিন্তু একটা পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল একদিন। আর সেই দুর্ঘটনায় ছেলেটাকে প্রাণে বাঁচাতে গিয়ে একখানা পা কেটে বাদ দিতে হল। ডাক্তার মুখার্জীকেই করতে হল এই দুঃখজনক কাজটি।

সেরে উঠল ভাগ্‌তুরাম। ওর বাপ এসে একদিন ডাক্তার মুখার্জীকে ধরে বলল, এ লেড়কাকে লিয়ে হামি কি করবে ডাগ্‌দর সাব? ও বেটা তো কুছ কাম মে আসবে নাই। কে জীবনভর দেখভাল করবে ওর?

ডাক্তার মুখার্জী বললেন, তবে আমাকে দিয়ে দাও, ওর ভার আমিই বইব।

সেই থেকে ভাগ্‌তুরাম ডাক্তার মুখার্জীর কাছেই থেকে গেল।

অসীম প্রাণশক্তি নিয়ে জন্মায় এক একটা ছেলে। তারা ভাগ্যের হাতে মার খেলেও কিছুতেই হার মানতে চায় না। ভাগ্‌তুরাম সেই জাতের ছেলে।

সে ক্রাচ বগলে সারা পাহাড় চষে বেড়ায়।

তখনও বিয়ে হয়নি ঝিন্নিদেবীর। নাগ্‌গরের আর্ট গ্যালারিতে

দিন কাটছে। ডাক্তার মুখার্জীর সঙ্গে চলেছে অনুরাগ পর্ব। মানালী থেকে নাগগরে এই পঙ্গু ভাগতুই ছুটে ছুটে খবর লেন-দেনের কাজ করেছে।

সে সব স্বপ্নের দিনগুলোর কথা ভুলতে পারে না ঝিন্নিদেবী। আজ ভাগতু ঝিন্নিদেবীর সংসারে অপরিহার্য। নির্লোভ, আনন্দময়, অভিমানী, শিশুর মত সরল একটি হৃদয়ের অধিকারী এই যুবক। এ বাড়ির প্রতিটি মানুষকে যেন বুক দিয়ে আগলে রেখেছে।

ঝিন্নিদেবীর মনে হয়, ভাগতু তাঁর নিজেরই ছেলে। তিনুনির সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন।

দশেরা উৎসবে কুলুর ঢোল ময়দানে রাতে যে নাচের আসর বসে, তারই একটা ছবি এঁকেছে ঝিন্নি।

কয়েকটি নর্তক নর্তকী নাচছে চক্রাকারে। বেশ মাতন লেগেছে নাচে। জোড়ায় জোড়ায় কোমর জড়িয়ে নাচছে।

পুরো রঙ দেওয়া তখনও শেষ হয়নি, হঠাৎ দরজার সামনে মনে হল কেউ এসে দাঁড়িয়েছে।

হাতে তুলি, তিনুনি চোখ তুলে তাকাল।

মুহূর্তে বিস্ময় ঘনীভূত হল চোখের দৃষ্টিতে।

দরজা ধরে যে বাইশ চব্বিশ বছরের যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে সে সম্পূর্ণ অচেনা। সুদর্শন দীর্ঘদেহী যুবক। মেরুন রঙের ট্রাউজার্সের ওপর গাঢ় হলুদ রঙের টি-শার্ট পরেছে। বুকের মাঝখানে লেখা, 'উই আর ফ্রেন্ডস্'।

তিনুনিকে তার পরিচয় দিতে গিয়ে ছেলেটি বলল, আমি বদরী-প্রসাদজীর নাতি। তাঁর মেয়ের ছেলে।

ভেতরে এসে বসুন মিঃ অর্কদীপ। কখন পেঁছলেন?

ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে একমুখ হাসি ছড়িয়ে ছেলেটি বলল, আমাকে কেবল অর্ক বলে ডাকলেই খুশী হব।

অসংকোচে অর্ক বসে পড়ল তিনুনির মুখোমুখি একটা চেয়ারে।

তিনুনি বলল, অর্কের আবির্ভাবের ঘোষণা আমি ভোর-বেলাতেই জজসাহেবের মুখ থেকে শুনেছি। তবে ঠিক কোন

মুহূর্তে এত দূরের বিদেশী মানালীতে এসে পেঁছবেন তা জানতে পারিনি।

দরজার সামনে আর একটি মুখ দেখা দিল। উত্তরটা সেই মুখ থেকেই শোনা গেল।

বেলা এগারোটায়। একখানা সাদা মারুতিতে সওয়ার হয়ে। আমিই তো ওঁকে জাস্টিস বদরীপ্রসাদের বাড়ির পথ দেখিয়ে দিলাম।

অর্ক তৎক্ষণে পেছন ফিরে বলল. হাঁ ইনিই আমাকে নানার বাড়ির নিশানা বলে দিয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিন্নি বলল, ইনি আমার দাদা ভাগ্‌তুরাম।

অর্ক হ্যাণ্ডশেক করতে গিয়েও হাতখানা টেনে নিয়ে নমস্কার করল। তখনও ভাগ্‌তুরাম হাতের ক্রাচ যথাস্থানে নামিয়ে রাখেনি।

এবার ক্রাচ দুখানা নামাতে নামাতে বলল, আপনারা জায়গামত বসে থাকুন আমি চায়ের ব্যবস্থা করছি।

অর্ক অমনি বলল, 'আপনারা' নয়, 'তোমরা' আর 'থাকুন' নয়, 'থাক'।

চায়ের আর একখানা কাপ পাওয়া গেল ছবিঘরে, কিন্তু ভাগ্‌তুর ঝোলায় খাবার প্লেট এসেছে একখানা মাত্র।

তাই সই। প্লেটে ঢালা হল সামোসা আর কচুরি। বিকেলে চায়ের আসরের জন্য বাড়িতে তৈরী।

অর্ক বলল, দারুণ জিনিস।

তিন্নি বলল, তুমি কি কালিফোর্ণিয়াতে এসব পাও ?

প্রতি ছুটির দিনে মা এসব খাবার নিজের হাতে বানায়। বাবা বেঁচে থাকতে প্রতি রোববার অনেক আয়োজন হত। সেখানে মায়ের হাতের সামোসা ছিল মাস্ট।

ওরা গল্প করতে করতে একই প্লেট থেকে তুলে খেতে লাগল।

তিন্নি প্লেট থেকে একটা কচুরি তুলে নিয়ে ভাগ্‌তুরামের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, নে খা লোভী। জান অর্ক, রোজ খাবার থালায় বেশী কম নিয়ে মায়ের সঙ্গে এই দাদাটা ঝগড়া করে। ফিফ্‌টি গ্রাম হলেও ভাগ্‌তুদার দিকেই মায়ের পাল্লা ভারি।

একটা নির্মল হাসি ওদের মুখ থেকে ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। সে হাসির ঢেউ লাগল পাহাড়ে। দুচারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে সেই হাসির তরঙ্গ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে নেমে গেল ভ্যালির দিকে।

বদরীপ্রসাদ হাইকোর্ট জজ ছিলেন। তাঁর একটিমাত্র মেয়ে। ম্যাথমেটিক্সে ফাস্ট ক্লাশ পাবার পর এক ক্লাশ ফ্রেণ্ডকে বিয়ে করে দুজনেই হায়ার স্টাডির জন্য ইউ. এস. এ চলে যান। ডক্টরেট ডিগ্রি পাবার পর তাঁরা একটি ইউনিভারসিটিতে চাকরি করতে থাকেন। কয়েক বছর পরে অর্কদীপের বাবা প্রতিরক্ষা বিভাগে সাইনটিফিক্ রিসার্চ ইউনিটে কাজ পান।

দারুণ স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতরে কাটছিল তাদের দিন। ইতিমধ্যে সংসারে তৃতীয় অতিথিরও আবির্ভাব হয়েছে। দুজনের আনন্দ আবর্তিত হচ্ছে শিশুটিকে ঘিরে। জীবনকে সুন্দরভাবে ভোগ করার পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে তারা।

নাতিকে দেখার জন্য বদরীপ্রসাদ ও স্ত্রী সরযূদেবী আমেরিকাতে উড়ে গেলেন। সেখানে কয়েকমাস সবাই মিলে আনন্দ উৎসবে কাটালেন।

ফিরে আসার পর সরযূদেবীর মন বসে না সংসারের কাজে। নাতির মুখখানা বার বার ভেসে ওঠে চোখের ওপর। চার বছরের ছেলে সাইকেল চালাচ্ছে লনে। ক্যারাটের প্যাঁচ চালাচ্ছে নানার ওপর। ক্ষুদে ওস্তাদের মারে জব্দ হয়ে দুঁদে বিচারপতি লুটিয়ে পড়ছেন বিছানায়।

সাত বছরের অর্ককে নিয়ে তার বাবা মা আসবে মানালীতে একটা ছুটি কাটাতে।

নির্দিষ্ট দিনে এয়ারপোর্টে প্লেন ধরার জন্য আসছিল তারা। সময় খুব কম ছিল হাতে। অর্কের বাবাই গাড়ি চালাচ্ছিল। পাশে এক বন্ধু। দারুণ স্পীডে গাড়ি চলছিল। হঠাৎ ছিটকে ডিগবাজি খেল গাড়ি। বন্ধুটি হাত ভেঙে রক্ষা পেল। অর্ককে জড়িয়ে ধরেছিল তার মা। দুজনেই আশ্চর্যভাবে অক্ষত। কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল অর্কের বাবা। হাসপাতাল পর্যন্ত

পেঁছানো তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

এই আঘাতে প্রায় মূক হয়ে গিয়েছিল অর্কের মা।

বদরীপ্রসাদ স্ত্রীকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন মেয়ের কাছে। অনেক শাস্ত্রীয় শ্লোক আউড়ে বিচারক বদরীপ্রসাদ মেয়েকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেছিলেন, প্রস্তাব দিয়েছিলেন পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে আসার, কিন্তু কোন দিক থেকেই তিনি সফল হতে পারেননি। মেয়ে স্বামীর স্মৃতি বুকে আঁকড়ে পড়ে রইল আমেরিকায়।

তারপর দীর্ঘ ষোল বছরে বদরীপ্রসাদ অন্তত বার ছয়েক স্ত্রীকে নিয়ে গেছেন মেয়ে আর নাতির কাছে।

এখন অতি বৃদ্ধ ও অশক্ত হয়ে পড়েছেন জজ সাহেব। তাই নাতিই ছুটি নিয়ে দেখতে এসেছে নানা নানিকে।

অর্ক হায়ার কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকারী কাজে নিযুক্ত। টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা নামও করেছে।

চিকিৎসক বলে জজসাহেবের বাড়িতে প্রায়ই ডাক পড়ত ডাক্তার মুখার্জীর। সেই সুবাদে দুবাড়ির ঘনিষ্ঠতা।

তিন্নি দিনে একটিবার অন্তত না গেলে বৃদ্ধবৃদ্ধা নিজেদের অসুখী মনে করেন। অস্থির হয়ে পথের দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁদেরই মুখে তিন্নি কতবার শুনেছে অর্কের কাহিনী। কৃতি ছাত্র হিসেবে তার উত্থান, অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ অথচ স্নেহরসে মাখা তার ঘরোয়া জীবনের ছবিগুলিও। সরযূদেবী যখন এসকল গল্প করতেন তখন পাশে বসে থাকা বদরীপ্রসাদজীর মুখখানা নাতির কৃতিত্বের কাহিনীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। তাঁর চোখের দিকে তাকালে মনে হত, তিনি সামনেই ঘটনাগুলো ঘটতে দেখছেন। এসব তাঁর জানা ঘটনা, তবু তিন্নির সঙ্গে বসে যখন শুনতেন তখন তাঁকে দেখলে মনে হত, এই প্রথম তিনি কোন তাজ্জব কাহিনী শুনছেন।

ভাগ্তুরাম বেরসিক নয়। চায়ের পাট চুকলে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নিচে অনেক কাজ পড়ে। তোরা আয় আমি এগোচ্ছি।

অর্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এইতো দাদার মুখের কথা। তুই তুকারি না করলে কি দাদা মানায়।

তিনুনি অমনি বলল, এতকাল বিদেশে থেকে এসব অন্তরঙ্গ ঘরোয়া ডাকের কথা তুমি জানলে কি করে ?

আমার মা আদ্যোপান্ত ভারতীয়। ছোটবেলা থেকে এদেশের কথাবার্তা, আচার-আচরণ সবই তার কাছ থেকে শিখেছি, জেনেছি। আমার কথাবার্তায় কোন জড়তা দেখছ কি ?

তিনুনি বলল, একটুও না, সত্যি অবাক লাগছে !

ভাগ্তুরাম পথের দিকে ক্রাচখানা বাড়িয়ে বলল, তোরা গল্প কর, আমি এগোচ্ছি।

ভাগ্তু চলে গেলে ওরা আবার মুখোমুখি বসল।

অর্ক বলল, তোমার নিজের কোন দাদা আছে বলে তো শুনিনি ?

তিনুনির মুখখানা উত্তর দিতে গিয়ে উদ্ভাসিত হল, আমার নিজের আর কোন ভাইবোন নেই ঠিক, কিন্তু ভাগ্তুরাম আমার আপনার ভাইয়ের চেয়েও বড়। ও আমাকে কোলেপিঠে নিয়ে মানুষ করেছে। আমাকে ধমক দেয়, শাসন করে, কিন্তু দরকার হলে ও প্রাণ দিয়ে দিতে পারে আমার জন্যে। এটা কিন্তু কথার কথা নয়, খাঁটি সত্যি।

এরপর ভাগ্তুরামকে নিয়ে কিছুক্ষণ কথা চলল দুজনের ভেতর।

অর্ক এক সময় বলল, তুমি কি মায়ের মত শিল্পী হবে ভেবেছ ?

এই কয়েক ঘণ্টা আগে মানালীতে পেঁছে, আমার মায়ের সম্বন্ধে এত কথা জানলে কি করে ?

আমার মায়ের মুখে তোমাদের পরিবারের সব কথাই শুনেছি। তাছাড়া প্রায় প্রতি ডাকে নানির চিঠিতে তোমাদের খবর থাকবেই।

ও তাই।

তোমার বাবা হঠাৎ করে চলে যাওয়ায় আমাদের পরিবারেও

শোকের ছায়া ফেলেছিল। মা আক্ষেপ করে বলেছিল, আমি মা বাবার জন্যে কিছুই করতে পারিনি, যা করেছেন, ডাক্তার মুখার্জী। তাঁর সামান্য ঋণশোধের সুযোগ না দিয়েই তিনি চলে গেলেন।

তিনুনির গলায় কষ্টের স্বর ফুটে উঠল, বাবার প্রসঙ্গ এখন থাক অর্ক, এসো, আমরা বরং অন্য কথা বলি। হাঁ, তোমার প্রশ্নের উত্তর এখনও দেওয়া হয়নি। মায়ের ইচ্ছে গ্র্যাজুয়েট হবার পরে আমি পুরোপুরি ছবি নিয়েই থাকি।

অর্ক মন্তব্য করল, আন্টি ঠিকই বলেছেন।

তিনুনি মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, তুমি কি মুখ দেখে জাতকের সবকিছু জানতে পার নাকি? ছবি যে আমার হাতে আসবে এ কথা তুমি জানলে কি করে?

অর্ক বলল, মৌমাছি, প্রজাপতিকে দেখলেই বলে দেওয়া যায়, তাদের সবথেকে আকর্ষণের বস্তুটি কি, অথবা কোথায় তাদের মানায়।

মিষ্টি হাসির ঢেউ তুলে তিনুনি বলল, কম্পিউটারে তুমি ছবি আঁক না কবিতা লেখ?

তিনুনির হাসিতে যোগ দিয়ে অর্কও হেসে উঠল।

হাসি থামলে অর্ক বলল, তিনুনি, আজ কিন্তু তোমার কাছে অর্কদীপ নামে কালিফোর্ণিয়াবাসী কোন যুবক আসেনি। যে এসেছে সে এক জাঁদরেল জজ গৃহিণীর দূত মাত্র। নিছক একটি সমাচার পৌঁছে দিতে এসেছে।

তিনুনি ঘাড় কাৎ করে হাসি মুখে খবরটি শোনার জন্য চেয়ে রইল।

প্রভাতী চা ও নাস্তায় জজসাহেবের কোঠিতে তিনুনিদেবীর আমন্ত্রণ।

ঠিক আছে। কাল নাস্তার টেবিলে কালিফোর্ণিয়ার এক আগন্তুকের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হবে।

তিনুনি বলল, আমিও এখুনি নামব।

তিনুনি ভেতরের উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করল।

বনের সংকীর্ণ পথটা এখানে এসেই শেষ হয়েছে। লাইটপোস্ট থেকে ম্লান হলুদ বালবটা ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে বনের পথটাকে চেনাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনি দূরে দূরে কয়েকটা বালব টিম্ টিম্ করে জ্বলছে।

বন রহস্যময়। আকাশে চাঁদ নেই। ঝিঁঝির ডাক একটানা বেজে চলেছে।

ওরা হাত ধরাধরি করে নামতে লাগল।

যেখানে একটা বালব না থাকায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে অন্ধকার থমকে আছে সেখানে অনেক নিচের বাতিটার দিকে লক্ষ্য রেখে নামতে হচ্ছিল।

এখন তিন্নি শক্ত করে ধরেছে অর্কদীপের হাত।

তুমি আমার সঙ্গে নিশ্চিন্তে নেমে এসো। একটু আস্তে আর সাবধানে পা ফেলবে।

ওদের চলার গতি অনেকখানি কমে গেছে। এখানে শুধু চাপ চাপ অন্ধকার। ঝিঁঝিদের একটানা সানাই ঘন অন্ধকারে যেন মাতন তুলেছে। কয়েকটা জোনাকি উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে নাচতে নাচতে ওপরের দিকে উঠে গেল।

একবার থমকে থেমে দাঁড়াল অর্ক। হাতে টান পড়তেই থেমে গেল তিন্নিও। মুহূর্তে অজানা একটা আশঙ্কা তার সারা শরীরটাকে হিমেল ছোঁয়ায় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে তিন্নি বলল, দাঁড়ালে যে?

অর্ক বলল, শোন, ঝিঁঝিরা কি অদ্ভুত ভাবে ডাকছে।

তিন্নি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হল, অর্ক সত্যিই কবি। একটু আগে সে প্রজাপতি আর মৌমাছির কথা বলছিল। ফুল যে ওদের প্রিয় আর আকর্ষণের বস্তু তা যেমন কাউকে বলে দিতে হয় না তেমনি তিন্নির যে শিল্পের ওপর আকর্ষণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অর্কের উত্তরটা ভারি ভাল লেগেছিল তখন। এই মুহূর্তে ওর ভেতরে একজন সত্যিকার কবিকে আবিষ্কার করল।

তিনুনি বলল, ওরা রাতের রাগিণী তুলেছে।

ভারি চমৎকার বললে তো।

দেখ অর্ক, দিনের মত রাত্রি নিজেকে আলোয়, উত্তাপে প্রকাশ করে না। তার প্রকাশ বড় স্নিগ্ধ। দিনের বেলা সবকিছু বড় বেশী লাউড। রাতে ঐ যে আকাশে কটি ঝিকিমিকি তারা, এই যে অন্ধকারের স্রোতে ভেসে গেল কটি জোনাকি, ঝিঁঝিদের করুণ সুরে একটানা ভায়োলিন বাজানো, এগুলোতেই ঘোমটা পরা রাতের হৃদয়টাকে চেনা যায়।

তুমি দার্শনিক তিনুনি।

আমাকে এতবড় কমপ্লিমেণ্ট দিও না অর্ক। তবে আমি বলার চেয়ে ভাবতে বেশী ভালবাসি।

তোমার বলাও কিন্তু খুব সুন্দর।

আমি কথা কম বলি অর্ক। আজ হঠাৎ তোমার ভারি সুন্দর কয়েকটা অনুভূতি আমার মনকে ছুঁয়েছে, তাই এত কথা বলছি।

অর্ক বলল, আমার বুকের ওপর লেখাটা তোমার চোখে পড়েছে?

ওটা কেবল তোমার বুকের ভাষা নয় অর্ক, আমাদের মত আজকের সব তরুণ-তরুণীর হৃদয়ের ভাষা। 'উই আর ফ্রেণ্ডস'। কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনটা ভরে ওঠে অর্ক।

সামান্য সময়ে আর কোন কথা হল না। দুজনের হাতের স্পর্শ দুজনকে অনুভব করল।

চল নামি।

দুটি তরুণ তরুণী অল্প সময়ের ভেতরেই আলোর রাজ্যে এসে পড়ল।

তিনুনি বলল, চল তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

অর্ক বলল, আমি একবার যে পথে আসি সে পথ ভুলি না।

তিনুনি বলল, আমারও তোমার মত একটা গুণ আছে।

কি?

আমি যাকে একবার দেখি এবং একটি কথা অন্তত বলি তাকে কোনদিন ভুলি না।

অর্ক বলল, তোমার কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম।

দুজনেই হেসে উঠল।

হাসি থামলে অর্ক বলল, আমি পথ চিনি কিন্তু পথের বন্ধুকে সহজে ছেড়ে দিই না।

আবার হাসি, দুজনে দুজনের হাত ধরল।

তিন্নি বলল, এবার তোমাকে আর একটা পথ চিনিয়ে নিয়ে যাব। এটা বাঁধানো পথ নয়, আপেল বাগিচার ভেতরের পথ।

ওটা তো অন্ধকারে ঢাকা।

আমি কি তোমাকে অনেকখানি অন্ধকারের পথ পার করে আনিনি? তাছাড়া আমার ছবিঘরে ওঠার সময় তুমি তো ঐ অন্ধকারের পথটুকু একাই পেরিয়ে গিয়েছিলে।

অর্ক বলল, আমার ওঠার সময় কিন্তু তোমার ঘরের ঐ উজ্জ্বল আলোর কিছুটা রশ্মি ঐ পথে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তিন্নি বলল, ভয় নেই। ঐ আপেল বাগিচা জুলিয়েন আঙ্কেলের। ওখানে সারারাত আলো জ্বলে। তিনটি মেয়ে বাগিচার ভেতর কুঠিতে থাকে।

বাগানের পথে চলতে চলতেই ওদের কথা হচ্ছিল।

ওদের কাজ কি?

তদারকি করা। আপেল বাগানে জুলিয়েন আঙ্কেলের নার্সারি আছে। সেগুলোর পরিচর্যা করে ওরা। তাছাড়া 'এপ্রিল-মে'তে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হলে কিংবা হঠাৎ বরফ পড়তে শুরু করলে ওরা নানাভাবে ফলের গুটি রক্ষার চেষ্টা করে। ফলের মরসুমে তৈরী ফল খাবার জন্য ফ্লাইং ফক্সের হামলা তো আছেই। এরা সেই সব ঠেকায় নানা কৌশলে।

একটা কুহলের শব্দ ওরা শুনতে পেল। বাগিচার ভেতর দিয়ে জলস্রোত বয়ে চলেছে। জলে উপলে মিলে জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে।

একটা অপরিসর কংক্রিটের সাঁকো পেরিয়ে কুহলটার ওপারে গেল ওরা। সাঁকোর পাশে আলোটা বেশ উজ্জ্বল। সেই আলোর টুকরো পড়ে কুহলের স্রোত ঝলকাচ্ছে। তারই ধারে বাগানের একমাত্র পাইন গাছটি দাঁড়িয়ে আছে। পাইনের তলায় একটি মসৃণ

বাদামী পাথরের বেঞ্চ।

অর্ক বলল, যাঁর বাগান তিনি বেশ শৌখিন মানুষ।

তিনুনি বলল, জুলিয়েন আঙ্কেল যেমন শৌখিন তেমনি মেজাজী। আমার বাবার সঙ্গে ওঁর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। এখন আমাদের কুলু, মানালীর দুটো বাগানই উনি দেখেন।

একদিন ওঁর সঙ্গে আলাপ করব।

বেশ তো, আমি একদিন আঙ্কেলের কাছে তোমাকে নিয়ে যাব।

কি পরিচয় দেবে ?

বলব, আমার এক বিদেশী বন্ধু। সানসাইন অর্চার্ডের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

অর্ক বলল, এই বাগিচার নাম বুঝি 'সানসাইন অর্চার্ড ?'

এসো, আঙ্কেলের বাগিচার ঐ বেঞ্চে দুদণ্ড বসি।

ওরা বেঞ্চের ওপর পাশাপাশি বসল।

তিনুনি বলল, হাঁ বাগিচার ঐ নাম। এই অর্চার্ডের খ্যাতি আজও সব জায়গায়। জুলিয়েন আঙ্কেলের গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার এইট্টিন এইট্টি ফোরে মানালীতে আপেল বাগিচার পত্তন করেন। তাঁর নাম ছিল ক্যাপ্টেন এ. টি. বেনন।

কুলু ভ্যালিতে তিনিই তাহলে প্রথম আপেল বাগিচার পত্তন করেন ?

না, প্রথম করেন ক্যাপ্টেন লী 'বান্দ্রোলে'। তাঁর প্রেরণায় ক্যাপ্টেন বেনন 'মানালী'তে।

অর্ক বলল, এখন কুলুতে খুব উৎকৃষ্ট আপেলের অনেক বাগিচা হয়েছে বলে শুনেছি।

তোমার নানা বদরীপ্রসাদজীরও একটি বাগিচা আছে। ছোট কিন্তু মূল্যবান। কুলুর বিখ্যাত গোল্ডেন অ্যাপেলের গার্ডেন।

আমি জানি। উনি ঐ আপেল মার্কেটে পাঠান না। আত্মীয় বন্ধুদের পার্শেল করে উপহার পাঠান।

ঠিক। চাষবাসের দিকে ওঁর খুব নজর। উৎকৃষ্ট গমের একটি ক্ষেতও আছে। নানান ফুলের চাষ নিয়েও মেতে থাকেন।

হাঁ নানার এসব হবি আছে। শুনেছি তোমাদের উনি খুব ভালবাসেন।

তিন্নি বলল, তুমি হয়তো জান না, ওঁর গার্ডেনের প্রথম তোলা কয়েকটা আপেল উনি সবার আগে বাবার কাছে উপহার হিসেবে পাঠাতেন। বাবা মারা যাবার পর তোমার নানি নিজে এসে মাকে ঐ আপেল দিয়ে যান। তাছাড়া আমি নানার কাছ থেকে মাঝে মাঝে ফুল উপহার পাই।

অর্ক হেসে বলল, আমার নানা নানির কাছে কিন্তু তুমি আমার চেয়েও প্রিয়।

তিন্নি হেসে উঠে বলল, ঐ দেখ, তোমার কথা শুনে চাঁদটা পাহাড়ের মাথায় উঁকি দিয়ে হাসছে।

ধীরে ধীরে চাঁদটা পাহাড়ের মাথায় উঠে এল। কৃষ্ণা প্রতিপদের চাঁদ। ঝক্‌ঝক্‌ করছে। দুধ ঢেলে স্নান করিয়ে দিচ্ছে চরাচর। বনের মাথা থেকে সরে গেছে অন্ধকারের ঘোমটা।

একটি মেয়ে কুহলের ওপার থেকে অনুচ্চে ডাক দিয়ে বলল, তিন্নি দিদি?

তিন্নি এতক্ষণ কথায় মশগুল হয়ে কোনদিকে তাকায়নি। সে এখন শব্দের দিকে মুখ ফেরাল।

কে, পার্বতী?

কৌতূহলী মহিলাটি হাতছানি দিয়ে তিন্নিকে কাছে ডাকল। সে সংকোচে সাঁকো পেরিয়ে আসতে পারছিল না।

তিন্নি ওর কাছে এগিয়ে গেল।

ওরা হাত নেড়ে অনুচ্চে কথা বলছিল। অর্কের কানে এসে পৌঁছচ্ছিল না সে সব কথা।

তিন্নি দিদি, ঐ সুন্দর ছেলেটি কে? ওকে আগে তো কখনো মানালীতে দেখেছি বলে মনে হয় না।

ছেলেটি আজই এসে পৌঁছেছে আমেরিকা থেকে। জজ সাহেবের নাতি। ওকে এই বাগানের ভেতর দিয়ে বদরীপ্রসাদজীর বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলাম।

তোমার কুঠিতে গিয়েছিল বুঝি?

তিন্নি পাহাড়ের ওপর ছবিঘরের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাল।

আমি যাচ্ছি তিন্নি দিদি।

তিন্নি বলল, যাও, তোমাদের তো আবার খাবার সময় হয়ে গেছে। আমি এখনি এই পথেই ফিরে আসব।

অর্ককে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল তিন্নি।

সানসাইন অর্চার্ড পেরিয়ে পথ। পথের ওপারে বদরীপ্রসাদের ছোট্ট বাগান। তারপরেই জজসাহেবের ছবির মত বাড়িখানা।

এবার নিশ্চয় যেতে পারবে?

পারব, কিন্তু তুমি আসবে না?

আসব, তবে আজ নয় কাল। নাস্তার নিমন্ত্রণে।

অর্ক হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে পথ পার হয়ে বাগানে নেমে গেল। ওর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল তিন্নি।

দুই

মা বলল, এত দেরী কেন রে তিন্নি? সেই কত আগে ছবিঘরের আলো নিভতে দেখলাম, ছিলি কোথায়?

কেন, ভাগ্তুদা তোমাকে কিছু বলেনি?

বদরীপ্রসাদজীর নাতি এসেছে বলেছিল। সে নাকি ছবিঘরে গিয়েছিল তোর সঙ্গে দেখা করতে।

তিন্নি হঠাৎ মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, ভেরি ভেরি হ্যাণ্ডসাম ইয়ং ম্যান। ওকে তোমার সামোসা খাইয়ে দিয়েছি। বলল, দারুণ!

মোটে তিনটে তো পাঠিয়েছিলাম, একটা ভাগ্তুর, তোর দুটো।

ভাগ্তুদার একটা কেন?

ও তো এখানে খেয়ে গেছে। তবু তুই ওকে না দিয়ে খাবি না বলে একটা বেশী পাঠিয়েছিলাম।

তোমার লোভী পুত্রকে একটা খাইয়েছি। আমরা দুজনে বাকি দুটো খেয়েছি। তাই খেয়েই অর্কদীপ প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ছেলেটির নাম অর্কদীপ বুঝি?

হাঁ মা। নামটা কিন্তু বেশ।

অর্কদীপ মানে কি রে? তোর বাবা তো তোকে সংস্কৃত পড়িয়েছিল।

তিনুনি বলল, অর্ক মানে সূর্য। সূর্য তো বিশাল এক দীপ। সেই দীপ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে আলো।

তা ছেলেটি জজসাহেবের ওখানে চলে গেল?

আমি এগিয়ে দিয়ে এলাম।

তোর দেরী হচ্ছে দেখে আমি ভাগতুকে তোর খোঁজে পাঠিয়েছিলাম। ও সারা পথ ঢুঁড়ে এসেছে, তোদের কোত্থাও দেখতে পায়নি।

আমি ওকে জুলিয়েন আঙ্কেলের আপেল অচার্ডের ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। পথটা শর্টকাট, তাই।

ওখানে মেয়েরা ছিল না?

থাকলই বা, ওরা কি আমাকে বাধা দেবে নাকি? পার্বতীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, অর্কের পরিচয় জানতে চাইল, বলে দিলাম।

ব্যাপারটা ঠিক হল না।

কেন মা, অন্যায় তো কিছু করিনি। বরং জুলিয়েন আঙ্কেলের অচার্ডের ঐ বেঞ্চটায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম। চাঁদ উঠল আর আমরাও উঠলাম।

ঝিনিদেবী বললেন, আমি জানি, কোন রকম অবিবেচনার কাজই তুই করতে পারিস না। তবু সামান্য সূত্র ধরে জটিল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

পরিস্থিতি হঠাৎ জটিল হতে যাবে কেন মা? ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না।

রাতে শোবার সময় তোকে সব বুঝিয়ে বলব।

অতএব ডিনার পর্ব, তারপর শয়ন পর্ব পর্যন্ত তিনুনিকে একটা সাসপেন্সে থাকতে হল।

শোবার ঘরের লম্বা বড় জানালাটার ধারে দুটো চেয়ার পেতে বসেছে মা ও মেয়ে। নিচে গভীর ভ্যালিটার বুক চিরে এঁকে বেঁকে মানালসু নদীটা বয়ে চলেছে। চাঁদের আলো পড়ে ধবধব করছে উপবীতের মত। পাইন গাছের সারি, বড় ছোট শিলাখণ্ড

ডুবে আছে চাঁদের স্বচ্ছ জলে। অদ্ভুত মায়াময় সাগরতল বলে মনে হচ্ছে চাঁদের আলোয় ডোবা গভীর ভ্যালিটাকে। উপত্যকার চারদিক ঘিরে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা, তারই ফাঁকে ফাঁকে কোথাও কোথাও জনবসতির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

ঝিন্নিদেবী ভ্যালির ওপারে একটা পাহাড়ের দিকে আঙুল তুলে বললেন, ঐ পাহাড়টার কথা মনে পড়ে তিন্নি ?

পড়ে বইকি মা। বার তের বছর বয়স পর্যন্ত বাবার টাট্টুর সামনে চড়ে এই ভ্যালি পেরিয়ে ঐ পাহাড়ে উঠেছি।

ওখানে তোর বালু আণ্টির বাবা পণ্ডিতজী বিকেলে সুর করে রামায়ণ পড়তেন, মনে পড়ে ?

পাহাড়ী বস্তির মেয়েরা সারি সারি বসে ওঁর মুখ থেকে তুলসীদাসের রামায়ণ গান শুনত। আর বাবার টাট্টু উঠোনে পেঁছলেই মেয়েরা নমস্কার করে সরে দাঁড়াত। পণ্ডিতজী পুঁথি রেখে উঠে আসতেন। বাবা পাশের ঘরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করত। আমি ততক্ষণ মেয়েদের দেওয়া তিলৌড়ি খেতাম। বাবা খেতে ভালবাসত বলে ওরা অনেক কটা ঠোঙায় পুরে আমার হাতে দিয়ে দিত।

সবই দেখছি মনে আছে তোর।

এই তো সেদিনের কথা মা।

পণ্ডিতজীর সাংসারিক অবস্থা কিন্তু ভাল ছিল না। মা মরা ঐ বালু আণ্টিকে নিয়ে খুব কষ্টেই তাঁর দিন কাটত। তিনি জাতিতে রাজপুত হয়েও কুলুতে এসে কৃষিজীবী কানেতের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, তাই পতিত হলেন নিজের সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে। দু'এক বিঘে ক্ষেতির ফসলে সংসার চলত টেনেটুনে। স্ত্রী মারা গেলেন। ছেলেটা মিলিটারীতে ঢুকল। একটি পয়সা পাঠাল না বাবাকে। ছোট মেয়েটাকে নিয়ে পণ্ডিতজী পড়ে রইলেন ঐ পাহাড়ী কুঠিতে।

তিন্নি বলল, বালু আণ্টির যে একজন দাদা আছেন, তা তো জানতাম না।

থেকেও যে নেই তার কথা কে মনে রাখে মা।

তিনুনি বলল, বালু আণ্টির সঙ্গে কি করে বিয়ে হল মা জুলিয়েন আঙ্কেলের? ধর্ম কিংবা পদমর্যাদা কোনটাতেই তো মেলে না। ওঁদেরও কি আমার মা বাবার মত ভালবাসার বিয়ে, না অন্য কিছু?

না মা, একটা পরিস্থিতির ভেতরে পড়ে ওদের বিয়েটা হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির ভেতরে আমি, তোর বাবা সকলেই জড়িয়েছিলাম।

কি রকম মা?

সেটা বলব বলেই আজ তোকে এখানে ডেকে এনেছি।

খানিক সময় থামলেন ঝিন্নিদেবী। তিনুনি অজানা কিছু জানার জন্য মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমি তখন থাকি নাগগরে। রোয়েরিক আর্ট গ্যালারিতে কাজ নিয়ে আছি। তোর বাবা তখন একটা ডিসপেনসারি খুলেছে মানালীতে। তোর নানা নরসিংলালজী কুলু মানালীর দুটো অর্চার্ডই তদারকি করছে।

তখন কি তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে?

না। তবে আমরা স্থির করে ফেলেছিলাম বিয়ে করব বলে। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।

তোমরা দুজনেই তো ব্রাহ্মণ ছিলে মা, তবে বাধাটা কোথায়?

আমার বাবা খুবই সাচ্চা মানুষ ছিলেন। তিনি কুলু মানালীর বাগিচা নিজের নামেই করে নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি কলকাতা থেকে তোমার বাবাকে ডেকে এনে তার হাতেই বাগিচা দুটি তুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাবা বলল, চাচাজী, আমি অতশত বুঝি না, আপনি যেমন বাগানের কাজ চালাচ্ছিলেন তেমনি চালাবেন। আমি মানালীতে ডাক্তারী করব।

সে না হয় হল, কিন্তু তোমাদের বিয়েতে বাধাটা এল কোন দিক থেকে?

আমার বাবার বড় লোক-নিন্দার ভয় ছিল। তাঁর মনে হয়েছিল আমাদের বিয়ে হলে লোকে ভাববে, নরসিংলালজী বড় চালাক লোক।

কেন এতে চালাকির কি আছে ?

ওরা ভাববে, নিজের মেয়েটিকে গছিয়ে দিয়ে দুটো বাগান নিজের কব্জায় রেখে দিলে। ডাক্তারের অন্য জায়গায় বিয়ে হলে নরসিংলালের আর এমন নবাবী থাকত না।

এর সমাধান হল কি করে ?

আমরা স্থির করে ফেলেছিলাম, যত বাধাই আসুক ডিসেম্বরে কোলি-রি-দেওয়ালির মেলা বসবে নাগ্গরে, সারা রাত বাজি পুড়বে, সেই দিনই আমরা বিয়ে করব। কিন্তু একটা বাধা এল। সে বাধাটা আমিই সৃষ্টি করলাম। আমারই ভুলে বিপর্যয় ঘটল।

কি রকম ?

পণ্ডিতজী অসুস্থ হয়ে পড়লে তোমার বাবা একবার তাঁকে দেখতে গিয়েছিল। সেখানেই বালুর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়। তোমার বাবার মনটি ছিল কোমল। পণ্ডিতজীর সংসারের চরম দুরবস্থা দেখে বালুকে তার ডাক্তারখানার কাজে বহাল করে। ডেলিভারি কেসে বালু তোমার বাবার সঙ্গে সব জায়গাতেই যেত। পাহাড়ী মেয়েদের সংকোচের জন্যেই এ ব্যবস্থাটা করতে হয়েছিল। কিন্তু খবরটা কানে আসতেই আমি ভুল বুঝলাম। নাগ্গর থেকে ছুটে গেলাম মানালী। বালুকে দেখলাম, পরিচয় হল। হঠাৎ তোমার বাবা সামান্য কারণে আমার সামনেই তিরস্কার করল বালুকে। অভিমানী বালু বিদায় নিল চোখের জল ফেলে। সে আর তোমার বাবার কাজে এল না। আমি নাগ্গরে ফিরে এলাম।

তারপর ?

ঘটনাচক্রে ভুল পথে পা বাড়াল বালু।

কি রকম !

সিজন টাইমে পথের ধারে যে রেস্টুরেন্টগুলো গড়ে ওঠে তারই একটাতে রান্নার কাজ নিল ও। সে বছর পঙ্গপালের মত কুলু মানালীর পথঘাট ছেয়ে ফেলেছিল হিপিরা। কি করে যেন তাদেরই একজন মোহগ্রস্ত করে ফেলল বালুকে। সন্তানসম্ভবা হল ও।

বালু আণ্টি !

দুঃখ পেও না মা, ঘৃণা কর না। অনেক সময় দারিদ্র্যের অসহ্য

জ্বালা সইতে না পেরে মানুষকে অনেক অনেক নিচে নামতে হয়।

ঝিন্নিদেবী দেখলেন তিন্নি দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কেঁদো না মা। মানুষই অবস্থার বিপাকে পাপের ভেতর জড়িয়ে পড়ে, আবার অবস্থার পরিবর্তনে নির্মল, শুদ্ধ হয়। তোমার বালু আন্টি এখন দুঃখের আগুন থেকে বেরিয়ে এসেছে নিষ্কলঙ্ক, উজ্জ্বল সোনার মত।

নিজেকে সামলে নিয়ে তিন্নি চোখ মুছে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বলে যাও মা।

হিপিরা উড়ে চলে গেল বালুকে নিঃস্ব করে দিয়ে। অসহায় বালু পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এ সময় জুলিয়েনদের ফলের বাগানে একটা কাজ পেয়ে গেল বালু। পার্বতীরা এখন যে সব কাজ করছে, সেই কাজ।

তখন কি জুলিয়েন আঙ্কেলই বাগিচার কাজ দেখতেন?

দেখত, তবে জুলিয়েনের বাবা তখন বেঁচে। তিনিই ছিলেন সবকিছুর মালিক।

তিন্নি বলল, এখন তুমি বালু আন্টির কথা বল।

বালু বাগানের কাজে যোগ দেবার পর জুলিয়েন মাস তিনেকের জন্য ফলের বাজার স্টাডি করতে বাইরে বেরিয়ে গেল। সেই অবসরে একটা দুর্ঘটনা ঘটল।

কি দুর্ঘটনা মা?

বাগিচায় কাজ করার সময় একদিন পা পিছলে পড়ে গেল বালু। আঘাত পেল প্রচণ্ড। অচৈতন্য অবস্থায় তাকে বাগিচার অন্যান্য মেয়েরা তুলে নিয়ে এসে বাবার ডিস্পেনসারিতে হাজির করল।

ঝিন্নিদেবী সামান্য সময় থামলেন।

তিন্নি তখন ঘটনাটা জানার আগ্রহে অধীর। সে বলে উঠল, মা তারপর?

কম্পাউণ্ডার বাবুকে সঙ্গে নিয়ে তোর বাবা বড় রকম একটা অপারেশন করল। গর্ভস্থ শিশুটি আগেই মারা গিয়েছিল, অনেক

চেষ্টায় মা বেঁচে গেল। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারল না একজন।

কে মা ?

লোকনিন্দার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারল না তোমার বাবা।

কেন মা, কি দোষ করল আমার বাবা ?

ঐ কম্পাউন্ডার রটিয়ে দিল বালুর ব্যাপারটা। কিছু আর গোপন রইল না। আশপাশের সমস্ত লোক ভেবে নিল তোর বাবাই এসব অবৈধ কাজ করেছে। আর তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য অপারেশান করে নষ্ট করে দিয়েছে শিশুটাকে।

আশ্চর্য ! যারা আমার বাবাকে দেবতা বলে ভাবত তারাই এমন মিথ্যা অপবাদ ছড়ালে !

অন্য মানুষকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই মা, আমি নিজেই অপরাধী।

তুমিও !

তোর নানাকে বিষিয়ে দিয়েছিল ঐ কম্পাউন্ডার। আমিও মা মানালী থেকে দূরে নাগপুরে বসে চোখের জলে ভেসে ঐ কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম।

ঝিন্নিদেবী সেদিনের কথা ভেবে গড়িয়ে পড়া চোখের জল আঁচলে মুছতে লাগলেন।

তারপর বাবার কি হল মা ?

বালু তার অপরাধের কথা তোর বাবার কাছে স্বীকার করল। এ নিয়ে তোর বাবা কোন লোকের কাছে সাফাই গাইতে গেল না।

উদ্দীপ্ত হয়ে তিনু নি বলল, কেন যাবে বাবা ? আত্মসম্মান যাঁর আছে তিনি কখনও কৈফিয়ৎ দিতে যাবেন না।

এরপর একটি অবাক কাণ্ড ঘটল।

কি কাণ্ড মা ?

তোর জুলিয়েন আঙ্কেল ট্যুর থেকে ফিরে এসে বাবার মুখ থেকে সব কথা শুনল। শুনেই ক্ষেপে উঠে বন্ধুর সম্মান রক্ষার জন্য একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে বসল।

কি রকম ?

সে রটিয়ে দিল, বালুর গর্ভে তারই সন্তান ছিল। ট্যুর থেকে ফিরে এসে বালুকে সে বিয়ে করবে স্থির করে রেখেছিল। তার অনুপস্থিতিতে এই অঘটন ঘটে গেছে।

গ্রেট।

শুধু রটনা করে দিয়েই চুপচাপ বসে থাকেনি। নিজের মায়ের মতটুকুও আদায় করে নিল। তারপর রাজ্যসুদ্ধ লোককে চিঠি পাঠিয়ে বিয়ের নেমন্তন্ন করে বিরাট রিসেপশান দিল।

বালু আন্টির মনের অবস্থা তখন কি রকম ?

মেয়েটি তো আসলে সরল প্রকৃতির। সে ভাবতেই পারেনি এত গভীর নরক থেকে সে কোনদিন স্বর্গের দরজায় এসে দাঁড়াতে পারবে। তাই ডাক্তার আর তার বন্ধু জুলিয়েনের কাছে কেঁদে কেটে সারা হল।

বিয়ের পরও কি জুলিয়েন আঙ্কেল সমান সমাদর করতেন বালু আন্টিকে ?

ঐ বোহেমিয়ান মানুষটি আজ পর্যন্ত বালুকে তার নিজের মায়ের মত সমান মর্যাদার আসনে বসিয়ে রেখে দিয়েছে। ওর মত এতবড় হৃদয়ের মানুষ তোমার বাবা ছাড়া আর কেউ আছেন কি না আমার জানা নেই।

তিনুনি প্রাণখুলে হেসে উঠল।

হাসুলি যে ?

তুমি বাবাকে এতবড় কমপ্লিমেন্ট দিলে, তাই হেসে অভিনন্দন জানালাম।

অনেক দুঃখ দিয়েছি আমি তোর বাবাকে, কিন্তু এতবড় ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দিতে আমি কাউকে দেখিনি। সেবায়, সান্ত্বনায় ভরিয়ে দিত তার চারিদিকের মানুষদের, আর আপনজনদের ভরে রাখত তার বুকের পাঁজরে।

বাবার কথায় চোখ দুটো ছলছল করে উঠল তিনুনির।

ঝিন্নিদেবী মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, এখন শোন, কেন আমি জুলিয়েনের বাগান দিয়ে রাতে তোদের যাওয়াটা পছন্দ করিনি।

কেন মা ?

এক সময় বদরীপ্রসাদজীর মেয়ে সিমলায় কনভেন্টে থেকে পড়াশোনা করত। তখন বেননদের সঙ্গে ওঁদের খুব ভাবসাব ছিল। বদরীপ্রসাদজী থাকতেন দিল্লীতে। সরযূদেবী কিন্তু এই মানালীর বাড়িখানি আগলে থাকতেন। আপদে বিপদে সাহায্য চাইতেন বেননদের।

এখন তো ওদের সঙ্গে খুব যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না মা।

ঠিকই বুঝেছিস, তবে আসল কারণটা জানিস না।

কি কারণ মা ?

সরযূদেবীর ইচ্ছে ছিল নিজের একটি মাত্র মেয়েকে কাছে রেখে দেবার। সেজন্যে তিনি জাত খুইয়ে বেননদের ছেলে জুলিয়েনকেও জামাই করতে রাজি ছিলেন। স্বামী দূরে থাকত বলে জুলিয়েনকে কখনো সখনো সিমলা পাঠাতেন মেয়ের খোঁজ-খবর নিতে। অবশ্য সিমলায় জুলিয়েনদের প্রায়ই কাজ থাকত, সেজন্যে ওদের পক্ষে সিমলায় যাওয়া কোন ব্যাপারই ছিল না। একবার জজসাহেবের অসুস্থ মেয়ে সুমনাকে সিমলার কনভেন্ট থেকে নিয়েও এসেছিল জুলিয়েন। সুমনাকে বিয়ে করবে এমন মতলব তার আদপেই ছিল না। কেবল কাতর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে মানবতার খাতিরে এসব কাজ করত। কিন্তু অপমানিত হল একদিন।

কি রকম ?

বদরীপ্রসাদজী একবার বাড়ি এসেছেন। ছুটিতে সুমনাও এসেছে। সম্ভবত সেই প্রথম তিনি স্ত্রীর মুখ থেকে জুলিয়েনকে জামাই করার প্রস্তাবটি পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলেন জজসাহেব। আর ঠিক সেই সময়েই বাগান পেরিয়ে ওঁর বাড়ির দিকে আসছিল জুলিয়েন। জজসাহেব ঘরের ভেতর থেকে উত্তেজিত অবস্থায় স্ত্রীকে বললেন, ঐ যে লোফারটা আসছে। কথাটা সঙ্গে সঙ্গে কানে গিয়ে বিঁধে গেল জুলিয়েনের।

এরকম অসম্মানজনক একটা কথা বলে ফেললেন এত বড়

একজন সম্মানীয় লোক !

তাই বলেছিলেন মা ।

শুনে জুলিয়েন আঙ্কেল সহ্য করে গেলেন ?

এক মুহূর্ত থেমে দাঁড়াল জুলিয়েন। তারপর সোজা এগিয়ে গিয়ে জজসাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, বদরীপ্রসাদজী, এই প্রথম একজন অমানুষ, জুলিয়েন বেনন সম্বন্ধে ইতর কথা বলে পার পেয়ে গেল। আপনার জমির ওপর দিয়ে আমি এসেছি আবার জমিটা পেরিয়ে যেতে হবে, একথা ভেবে ঘৃণায় আমার সারা শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে। নিশ্চিন্ত থাকুন, এই অপবিত্র ভূমি জুলিয়েন বেনন আর কোনদিন মাড়াবে না ।

তিনুনি বলল, এ কথা আমার জানা থাকলে আমি কিছুতেই অর্ককে জুলিয়েন আঙ্কেলের অর্চার্ডের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতাম না। কিন্তু মা··· ।

বল ?

আমাদের সঙ্গে বদরীপ্রসাদজীদের এত ভাব ভালবাসা হল কি করে ?

ডাক্তারদের পরিবারের সঙ্গে কারু বিরোধ থাকে না মা। মানুষের সেবা করাই ডাক্তারদের কাজ। তাই মানুষও তাঁদের কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা জনদরদী ডাক্তারদের উজাড় করে দেন।

এবার তিনুনি বলল, কাল জজসাহেবের বাড়িতে আমাকে নাস্তার নিমন্ত্রণ করে গেছে। আমি কি যাব মা ?

অবশ্যই যাবে ।

তুমি প্রাণখুলে বলছ মা ?

নিশ্চয় ।

জুলিয়েন আঙ্কেল জানতে পারলে কিছু ভাববেন না তো ?

ঝিন্নিদেবী অবাক হয়ে বললেন, আমাদের সঙ্গে তো কারু বিরোধ নেই। তাছাড়া জুলিয়েন-বদরীপ্রসাদ বিরোধের চিরস্থায়ী না হলেও অস্থায়ী একটা সমাধান হয়ে গেছে। বলতে পারা যায় এখন ব্যাপারটা মন থেকে একেবারে মুছে না গেলেও মনের গভীরে চাপা পড়ে আছে।

এটা ঘটল কি করে মা ?

জ্বলিয়েনের বিয়ের রিসেপশানে তোর বাবা জজসাহেবের বাড়িতেও চিঠি পাঠনোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। জুলিয়েন এবং তার পরিবারের সবাই সেই আনন্দ উৎসবের দিনে তোর বাবার পরামর্শটি সানন্দে মেনে নিয়েছিল।

ওঁরা রিসেপশানে এসেছিলেন কি ?

জজসাহেব আসেননি, কিন্তু সরয়ূদেবী এসেছিলেন। তিনি সোনার লকেট ঝোলানো আসল একটি মুক্তোর মালা বালুর গলায় পরিয়ে দেন। তারপর জুলিয়েনকে একান্তে ডেকে তার হাতে তুলে দেন একটি দামী ঘড়ি।

তিনুনি বলল, তাহলে তো মা, দুবাড়ির ভেতর আর মনো-মালিন্য থাকার কথা নয়।

ঝিনিদেবী বললেন, ঐ একটা অনুষ্ঠান-বাড়িতে আসা-যাওয়া নিয়ে কিছু বোঝা যাবে না।

তুমি এ রকম কেন ভাবছ মা ?

আসলে জুলিয়েন নিজে ওদের বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করেনি, আর যাঁর সঙ্গে সংঘাত তিনি স্বয়ং আসেননি।

তিনুনি বলল, থাকগে মা, ওসব আমাদের ভেবে কাজ নেই। বড়রা ওঁদের মান-মর্যাদা, হিংসা-বিবাদ নিয়ে থাকুন। আমরা নতুন জেনারেশানের সবাই বন্ধু।

পরের দিন মিষ্টি, নোনতা, ফল ইত্যাদি নানা ধরনের খাবারে প্লেট সাজিয়ে সবাইকে পরিবেশন করলেন সরয়ূদেবী। সবাই বলতে অর্ক, তিনুনি আর ওঁরা দুজন।

খেতে খেতে ওঁরা নানা রকমের কথা বলছিলেন। হালকা হাসির কথায় হেসে উঠছিল সবাই। অর্ক তার বন্ধুদের বিষয়ে অনেক রকম মজার কাহিনী বলছিল।

চা পরিবেশনের সময় তিনুনি উঠে দাঁড়িয়ে নিজেই ভারটা নিল।

ভারি খুশী হয়ে উঠলেন জজসাহেব। বললেন, তোমার

মায়ের হাতে অনেকবার চা খেয়েছি, কিন্তু আমার বাড়িতে এসে তুমি নিজের হাতে চা পরিবেশন করছ, এর স্বাদ অন্য রকম।

অর্ক বলল, তবু কোন্ স্বাদটা একটু বেশী ভাল নানা ?

দুটোই উত্তম তবে এর স্বাদটা একটু বেশী মিষ্টি।

সরযূদেবী বললেন, মাঝে মাঝে তিন্নির হাতের চা পেলে এ বয়সটা বড় সুখে কাটত।

হঠাৎ বদরীপ্রসাদজী একটা কথা বলে ফেললেন, তাহলে চল এই মিষ্টি মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সবাই ক্যালিফোর্ণিয়া চলে যাই। সেখানে রোজ ওর হাতের চাটা অন্তত পাওয়া যাবে।

সরযূদেবী বললেন, তা কি করে হয়।

জজসাহেব বলে উঠলেন, কেন, ঝিন্নি তো প্রায়ই বলে, চাচাজী ছবি আঁকা শিখতে আমার বিদেশ যাবার যোগ ছিল, হল না। মেয়েটাকে যদি পাঠাতে পারি তাহলে কিছুটা অন্তত ইচ্ছা পূরণ হয়।

তিন্নির চা পরিবেশন হয়ে গিয়েছিল। সে এখন নিজের জায়গায় বসে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়েছে। চুমুক দিচ্ছে কাপে।

সরযূদেবী বললেন, তোমার কি ইচ্ছে তিন্নি ?

মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল তিন্নির মুখে। সে বলল, আগে তো ভারত-শিল্পটাকে বুঝি, তারপর বিদেশী আর্ট নিয়ে চর্চা করা যাবে।

অর্ক বলল, তুমি ভারত-শিল্প বলতে কি বোঝাতে চাইছ ?

আমাদের এই হিমাচল প্রদেশেই রয়েছে কাংড়া।

এক সময় কাংড়ার পাহাড় এলাকার রাজারা শিল্পীদের উৎসাহ দিতেন। ওখানে শিল্পের একটা শৈলী গড়ে ওঠে। এখন ঐ কাংড়া পেইন্টিং ভারতবিখ্যাত হয়ে গেছে।

অর্ক জানতে চাইল, আর কিছু ?

আরও অনেক কিছু আছে। অজন্তা গুহাচিত্র, মোগল আর রাজপুত পেইন্টিং। ভাস্কর্যের ব্যাপারটা এর ভেতর ধরছি না।

অর্ক বলল, আমি ছবি দেখতে ভালবাসি, তবে শিল্প নিয়ে

বিশেষ কোন চর্চা আমার নেই। কোন ছবি ভাল লাগে, কোনটা লাগে না। নিছক চোখের ভাল লাগালাগি।

একটু থেমে গিয়ে অন্য একটা প্রশ্ন করল অর্ক, তোমাকে যদি ছবি আঁকা শেখার জন্য ভারত ছাড়া অন্য কোন একটা দেশ বেছে নিতে বলা হয়, তুমি কোনটা নেবে ?

আমার ফার্স্ট চয়েস জাপান, তারপর ফ্রান্স।

অর্ক বলল, আমি ছবির কথা বলছি না, আমেরিকা সম্বন্ধে তোমার কোন ঔৎসুক্য নেই ?

যাঁরা বিজ্ঞান চর্চা করছেন, তাঁদের কাছে ওটা প্যারাডাইস। আমি বিজ্ঞানের ছাত্রী নই। যতটুকু পড়েছি বা শুনেছি তাতে আমেরিকার সমাজ-ব্যবস্থা আমার চোখে ভাল লাগে না। বাবা মা, অথবা বুড়ো দাদা দাদি, নানা নানিকে নিঃসঙ্গ ফেলে আমরা চলে যাবার কথা ভাবতেও পারি না। তবে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ওদেশে নিশ্চয়ই যেতে পারি।

জজসাহেব এবং সরযূদেবী একটা উদ্দেশ্য মনে রেখে তিন্নির কাছে আমেরিকা যাবার কথা উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিন্নি আর অর্কের কথাবার্তা থেকে তাঁরা বুঝলেন, আমেরিকা যাবার ব্যাপারে তিন্নি আদপেই উৎসাহিত নয়। তবে তিন্নির শেষ কথাটা তাঁদের প্রাণকে স্পর্শ করল। 'বুড়ো দাদা দাদি, নানা নানিকে নিঃসঙ্গ ফেলে আমরা চলে যাবার কথা ভাবতেও পারি না।'

অর্ক বলল, কোন দিন যদি তোমার দেশটাকে দেখার জন্যেও আমেরিকা যাবার ইচ্ছে হয় তাহলে জানবে আমাদের বাড়ির দরজায় তোমাকে স্বাগত জানানোর জন্য আমরা উপস্থিত আছি।

তিন্নি বলল, তার আগে আজকের ডিনারে তোমাকে স্বাগত জানাবার জন্য আমরা সপরিবারে সামনের দরজায় হাজির থাকব।

তিন্নির কথা বলার ধরনে জজসাহেব, অর্কদীপ আর সরযূদেবী প্রাণখুলে হেসে উঠলেন।

টেবিল ছেড়ে ওঠার সময় তিন্নি বলল, আমি দুপুর থেকে ছবিঘরে বসে কাজ করব। তুমি যখন হোক চলে আসবে। একেবারে ডিনারের পর আমি তোমাকে পেঁছে দিয়ে যাব।

তিন

দর্শনীয় স্পটগুলো ছবিঘরে বসে দু'তিন দিনের ভেতরেই মোটামুটি স্থির করে ফেলেছে তিন্নি। দারুণ রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অর্ক। থাকার জায়গার ব্যবস্থাগুলো দুজনে মিলে পাকা করে এসেছে ট্যুরিস্ট অফিস থেকে।

ভাগ্‌তুরাম ইতিমধ্যেই ইলেক্‌ট্রিক অফিসে গিয়ে ছবিঘরে যাবার রাস্তায় খারাপ বাল্‌বটা বদলানোর ব্যবস্থা করেছে। এখন রাতে ঐ পথে যাওয়া আসার কোন অসুবিধে নেই।

তিন্নি দরজার সামনে একটা ধবধবে সাদা, ঝালর দোলানো ঝাড়লণ্ঠন ঝুলিয়েছে। তার তিনকোণা কাচে আলো পড়ে রামধনু ঝলকায়। বনের পথে সে আলো ভারি মায়াময় মনে হয়। ওদের নিচের বাংলোর জানালা দিয়ে মাঝরাতে ছবিঘরের দিকে তাকালে মনে হয়, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র বনের মাথায় জেগে উঠেছে।

অর্ক পুরো একটি দিন ঐ ছবিঘরে কাটানোর পরিকল্পনা করে তিন্নিকে বলল, তিন্নি, ছবিঘরে পুরো একটা দিন কাটালে কেমন হয়?

তিন্নি বলল, দারুণ পরিকল্পনা, তবে রাত কাটাতে হলে এতগুলো মানুষকে জায়গা দেওয়া যাবে না।

অর্ক বলল, কেন নয়? আমরা মেঝেতে ঢালা একটা ফরাস পেতে তার ওপর সবাই মিলে বারোয়ারি বিশ্রাম নেব। হোল্‌ নাইট হাসি গান গল্প হুর্‌রে। ঘুমকাতুরেদের জন্য খোলা থাকবে তোমার ছোট্ট ড্রেসিং রুমটা। নিচে পাতা মোটা কার্পেট-খানাতে দিব্যি গড়িয়ে নিতে পারবে।

ও. কে.। তোমার পরিকল্পনার জন্যে ধন্যবাদ।

মুখে তর্জনী ঠেকিয়ে একটুখানি চিন্তা করে নিয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তিন্নি অর্কদীপের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল ছবিঘরের পেছনে।

একটা ছোট্ট আয়তক্ষেত্রের ওপরে একটি টানা করোগেটের শেড। তার চারদিক কাচ দিয়ে ঘেরা। শেডটির রঙ ভারি সুন্দিং—

সী-গ্রীন।

ওটা আসলে একটা নার্শারী। ভাগ্‌তুরামের তদারকিতে ক্রিসেনথিমাম, ডালিয়া, হলিহক ইত্যাদির চারা সংবর্ধিত হয়।

তিন্নি বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, দারুণ তোমার পরিকল্পনা, আমার মাথাতেই আসেনি। আমি একটু যোগ করছি, সেদিন এখানেই আমাদের পিকনিক হবে। দশ পা গেলেই ডানদিকে ঝর্ণা, এন্‌তার ড্রিংকিং অ্যান্ড কুকিং ওয়াটার পাওয়া যাবে। একটা বড় স্টোভ, প্রেসার কুকার আর কিছু বাসন কোসন নিচ থেকে তুলতে হবে। তিনটে বড় বড় প্ল্যাস্টিকের বালতি আর একটা মাঝারি ড্রাম এখানেই আছে।

অর্ক বলল, আমরা সকলে এক একটা করে পদ রান্না করব।

তিন্নি বলল, একটি কেরলের মেয়ে চণ্ডিগড়ে ক্যারলদের সঙ্গে ডাক্তারী পড়ছে। তার বাবা ওখানকার ডাক্তার। সেও নাকি আসছে।

অর্ক বলল, তবে ও ইড্‌লি, সম্বর ডাল আর চাট্‌নি বানাবে।

তুমি এসব খাবারের নাম জানলে কি করে আমেরিকাবাসী?

শুধু নাম জানা নয়, টেস্টও করেছি, দারুণ। ওখানে বাবার সঙ্গে কাজ করতেন এক কুট্টি। তাঁর বাড়িতে যাতায়াত আছে। ওখানে মাঝে মাঝে গেলে কুট্টি আণ্টি খাওয়ান।

তুমি সেদিন কি বানাবে?

ডিনারে চিকেন স্যুপ।

তিন্নি বলল, তাহলে ক্যারল বানাবে ফ্রুট কাস্টার্ড।

তুমি কি বানাবে?

আমি লাঞ্চে ফ্রায়েড রাইস, কাশ্মীরি মটনকারি, ডাল আর কিছু সব্‌জি বানাব।

অর্ক বলল, আঃ, এখুনি গন্ধ পাচ্ছি রান্নার।

তুমি দেখছি দারুণ জমাতে পার, আর পেটুক তো বটেই।

আমার মাও ঠিক এই কথা বলে।

তিন্নি হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, দেখ আমি ঠিক ধরেছি।

অর্কও তিন্নির হাসিতে যোগ দিল। দুটি তরুণ তরুণীর

নির্মল হাসিতে ভরে উঠল ছবিঘর।

ঝিন্নিদেবী বাগানে ফুলগাছের পরিচর্যা করছিলেন। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে মাথা ঈষৎ কাৎ করে দেখলেন। দেখেই উঠে দাঁড়ালেন।

দুটো টাট্টু যোগাড় করে তার ওপর সওয়ার হয়েছে তিনুনি আর অর্ক। তারা এগিয়ে আসছে এদিকে। বাগানের পাশ দিয়েই পাথর বাঁধানো পথটা নেমে গেছে ভ্যালির দিকে। সম্ভবত দুই তরুণ-তরুণীর গন্তব্য ঐ ভ্যালি পেরিয়ে কোথাও।

ঝিন্নিদেবীকে দেখেই ওরা টাট্টুর ওপরে বসে হাত নাড়তে লাগল।

কোথায় চলেছিস ?

এই ভ্যালির দিকে মমু।

কখন ফিরবি তোরা ? একটু পরেই তো বিকেলের চা রেডি হয়ে যাবে।

টাট্টুর পিঠে চাপড় মেরে তিনুনি এগিয়েযেতে যেতে বলল, ঠিক সময়ে ফিরতে না পারলে তোমরা কিন্তু আমাদের জন্য অপেক্ষা না করেই চা খেয়ে নিও।

অর্ক যেতে যেতে হাত নেড়ে বলল, কিছু ভাববেন না আন্টি, আমরা খুব সাবধানে ভ্যালিতে ওঠা নামা করব।

ওরা পাশাপাশি চলেছে। ঝিন্নিদেবী একটা পাইনগাছের কাণ্ডে হাত রেখে ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

ধীরে ধীরে স্মৃতির কুয়াশা সরে গিয়ে একটা ছবি ফুটে উঠতে লাগল চোখের ওপর।

তখনও বিয়ে হয়নি। ডাক্তার মুখার্জীকে সঙ্গে নিয়ে সে গিয়েছিল নাগুরে কোলি-রি-দেয়ালির উৎসব দেখতে। ডিসেম্বরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বরফ পড়ে ঝকঝক করছিল চারদিক। নরসিংলালজী এই শীতে কাবু হয়ে পড়বেন বলে আসেননি মেলায়।

একটা পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে নিচে মেলার সমারোহ দেখছিল দুজনে। অপূর্ব একটা নাচ হচ্ছিল মেলা-প্রাঙ্গণে। একদল নর্তকী

গোলাপী আভার পোশাক পরে পদ্মের পাপড়ির মত নিজেদের মেলে দিয়ে নাচছিল। তার চারদিকে সাদা পোশাকে তরঙ্গ তুলে বৃত্তাকারে নাচছিল একদল নর্তক। তারা পদ্মের দিকে একবার এগিয়ে যাচ্ছিল, পরক্ষণে পিছিয়ে আসছিল। ঠিক যেন সমুদ্র-তরঙ্গের এগিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে আসার ছন্দ।

দেখতে দেখতে শেষ হল বেলা আর সাঙ্গ হল মেলা। তারা ফিরে এল তাদের রাতের আশ্রয়ে। রোয়েরিক আর্ট গ্যালারী তখন বন্ধ। সে তার কোয়ার্টারেই দুজনের থাকার ব্যবস্থা করেছিল। পর্বতের ওপর নির্জন নিবাস। চারদিকে পাইনের বন। নিচে বহুদূর ছড়ানো উপত্যকা। মাঝে মাঝে নীলাভ পাহাড়। দূরে ঝকঝকে তুষার পর্বত। উপত্যকার মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে উপবীতের মত বিপাশা।

আশ্চর্য এক স্বপ্নলোকে সেদিন নিবিড়ভাবে বসেছিল দুজনে। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছিল। জানালা দিয়ে হঠাৎ দেখা গেল কেল্লা থেকে হাউই উঠছে আকাশে। একটা শব্দ করে একসময় ফেটে গেল হাউইটা। অমনি শূন্যে ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল তারার ফুল।

কত ফুল যে ফুটল ঝরল সেদিন তার লেখাজোখা নেই।

সে রাতে নির্জন কোয়ার্টারের নিভৃতে ফুটে উঠেছিল দুটি ফুল। তাদের সুবাস নেবার জন্য সেই অসম্ভব শীতের রাতে কেউ উপস্থিত ছিল না। দুজনেই দুজনের আঘ্রাণে সম্মোহিত হয়েছিল। আত্মনিবেদনের মুহূর্তগুলো যে কত সুষমায় ভরে উঠতে পারে তার সাক্ষী ছিল কেবল তারা দুজনেই।

পরদিন নিচের পাহাড়ী বস্তি থেকে টাট্টু যোগাড় করেছিল তারা। তারপর আনন্দ আর উত্তেজনায় ভরা মন নিয়ে টাট্টুতে চেপে তারা নদীর কূল ধরে এসেছিল নাগগর থেকে কুলুতে।

আজও কি তিনুনি তেমনি অর্কের সঙ্গে টাট্টুতে চেপে পাশাপাশি চলেছে খুশীর ফুল ছড়াতে ছড়াতে? দুটি হৃদয় কি আজ উন্মুখ হয়ে উঠেছে দুজনকে সবকিছু বিলিয়ে দেবার জন্য?

এ কি ভেবে চলেছে সে। অর্ক তিনুনির বন্ধু। বন্ধুর কাছে হৃদয়

উজাড় করে সবকিছু বলা যায়, কিন্তু সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া যায় না। সেজন্যে প্রয়োজন, বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ দুটি হৃদয়।

তিন্নির সেই দোসর ক্যারল বেনন। অর্কদীপ নয়।

ও বহুদূর থেকে উড়ে আসা এক যাযাবর পাখি মাত্র। ওর সঙ্গে দুদিনের বন্ধুত্ব রচনা করা যায়, কিন্তু চিরস্থায়ী নীড় রচনা করা যায় না।

অবশ্য ঝিন্নিদেবী প্রতিটি মেয়ের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। মেয়ে উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিশেষভাবে তার মা তাকে শরীর, মন দুদিক থেকেই গড়ে তুলবেন। কঠিন শাসনের বদলে সহানুভূতি আর উপযুক্ত সহযোগিতাই হবে তাঁর কাজ। বড় কঠিন এ কাজ, তবু ধৈর্যহীন হলে চলবে না। মায়ের চরিত্রে দৃঢ়তার সঙ্গে থাকা চাই অফুরন্ত সহ্যশক্তি, স্নেহ আর বন্ধুত্বের ভাব। নতুন নতুন পরিকল্পনায় মেয়েকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা থাকা চাই তাঁর। মেয়ের সমস্যাগুলি বুঝতে হবে অনুত্তেজিত ভাবে। কতটা পরিমাণ সাহায্য করলে বিপদের ঝুঁকি এড়িয়ে তাকে সুখী করা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট ও সতর্ক থাকতে হবে।

ঝিন্নিদেবী কেবলমাত্র চিন্তার ক্ষেত্রে এগুলিকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি, তিন্নির ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিদিন এগুলিকে প্রয়োগ করে চলেছেন।

তিন্নিকে নিয়ে তিনি ভারি সুখী। এ বয়সেই তার চরিত্রে এসেছে গভীরতা। তার সঙ্গে মিশেছে নম্রতা। উচ্ছ্বসিত হয়ে সে কখনো তার মনের ভাবকে ছড়িয়ে দেয় না। তার মনের ভাবগুলো ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলে ফুটে ওঠে। তাই সেগুলো সব সময়েই বোদ্ধার কাছে মধু গন্ধে ভরা।

স্বামীকে হারিয়ে ঝিন্নিদেবীর মনে যে শূন্যতা এসেছিল, সেটাকে অন্যভাবে পূর্ণ করে দিয়েছে তিন্নি। তাই ঝিন্নিদেবীর প্রায়ই মনে হয়, তিন্নি তাঁর চোখের আড়ালে চলে গেলে বুকের ভেতর অসহ্য একটা কষ্ট বাসা বাঁধবে। তবু পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে মেয়ের সুখকেই তিনি প্রাধান্য দেবেন।

ডাক্তার মুখার্জীর অকালে চলে যাবার পরে ঝিন্নিদেবী যখন

নিজেকে অসহায় ভাবছেন, পনেরো বছরের মেয়েটিকে নিয়ে কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, তখন একদিন ঘরে এসে ঢুকলেন জুলিয়েন বেনন।

জুলিয়েন চিরদিনই কথা বলেন স্পষ্ট আর সোজাসুজি। ভারি মেজাজি মানুষ। দরিয়ার মত দিলখানা।

ঝিনি, তোমার সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ আছে।

বলুন ভাই।

ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে না গিয়ে ডাক্তারী পড়তে চলে গেল চণ্ডিগড়ে। তুমি জান, আমি চিরদিনই নিজের মতে চলি। আমার ছেলেকেও স্বাধীনতা দিয়েছি তার নিজের ইচ্ছামত চলতে।

ঠিক আপনার মত আমিও তিনুনিকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছি।

জুলিয়েন জোরের সঙ্গে বললেন, তাই আমাদের ছেলেমেয়েরা অসংকোচে তাদের মত প্রকাশ করতে পারে। ক্যারলকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে ছিল, হঠাৎ ডাক্তারীতে মত বদল করলে কেন? অবশ্য যেটা খুশি তুমি পড়তে পার।

ক্যারল বলল, আসলে ডাক্তারী পড়ার কথাটা পরে মনে হল। ডাক্তার আঙ্কেল চলে গেলেন। তাঁর এত বড় অপারেশান থিয়েটার, ডিসপেনসারী চালাবার মত লোক আর রইল না। বহু দূর-দূর অঞ্চলের মানুষ তাঁর হাতের ছোঁয়ায় রোগের যন্ত্রণা ভুলে যেত। তারা এখন অসহায় বোধ করছে। তাই…।

তোমার এ ডিসিশানে আমি খুবই খুশী হয়েছি।

ক্যারল আবার বলল, তাছাড়া....।

ও চুপ করে গেল দেখে জিজ্ঞেস করলাম, তাছাড়া কি?

ক্যারল বলল কি জান, ড্যাডি, তুমি যখন আঙ্কেলের শবযাত্রার ব্যবস্থা করছিলে তখন একটা পিলারের ধারে দাঁড়িয়ে তিনুনি অঝোরে কাঁদছিল। আমি তার কাছে সেই মুহূর্তে কথা দিয়েছি, ডাক্তার আঙ্কেলের মত আমি ডাক্তার হব।

আমি ক্যারলকে বললাম, ঠিক পথই তুমি বেছে নিয়েছ।

আর সেই মুহূর্তে একটি সত্যকে আমি আবিষ্কার করলাম।

ঝিন্নিদেবী বললেন, কি সত্য ভাই ?

ক্যারল তিনুনিকে ভালবাসে। তিনুনি দুঃখ পাক সে সেটা একেবারেই চায় না।

ঝিন্নিদেবী বললেন, ক্যারল আর তিনুনির ভেতর যে একটা আকর্ষণ আছে তা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। তবে এ নিয়ে তিনুনিকে আমি কখনও কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

জুলিয়েন বললেন, দরকারও নেই। ওরা ওদের মত ভাবুক, নিজেদের গড়ে তুলুক, ইচ্ছে করলে ওরা নীড় রচনার কথাও ভাবতে পারে। এ বিষয়ে তোমার কিছু আপত্তি থাকলে অসংকোচে বল।

আমি আর ডাক্তার মুখার্জী দুজনেই ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমাদের ভেতর কোন জাতি নিয়ে কোনরকম সংস্কার ছিল না। এসব বিষয়ে আমার মেয়ের মাথা একদম পরিষ্কার। সে জাতপাত বোঝে না। পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, শিক্ষিত, সুভদ্র একটি মানুষকে সে অনেক বেশী মর্যাদা দেয়।

জুলিয়েন বেনন বললেন, আমি তোমার কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম ঝিন্নি। ভবিষ্যতে ওরা কি করবে না করবে সেটা ওদের ব্যাপার। কিন্তু ওদের মিলনকে কেন্দ্র করে জাতিগত বাধা যদি দুটো পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাহলে তা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

ঝিন্নিদেবী বললেন, আপনি কেবলমাত্র আমার স্বামীর বন্ধু নয়, আমাদের পরিবারের একজন। সুতরাং এখানে জাতিগত প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। ওরা ওদের সঠিক পথটি খুঁজে নিক, আপনার মত আমারও এই কামনা।

সেদিন থেকে দুই পরিবারের মিলনের এক অলিখিত চুক্তিপত্র দুটি যুবক যুবতীর স্বাক্ষরের অপেক্ষায় পড়ে আছে।

তিনুনি তার টাট্টুতে চড়ে সামনে এগিয়ে চলেছে। সে পথ-প্রদর্শিকা। পেছনে তাকে অনুসরণ করে আসছে অর্কদীপ।

শিক্ষিত ঘোড়া একসময় সঠিক পা ফেলতে ফেলতে নেমে গেল

ভ্যালির নিচে। এখন চারদিকে পাহাড়, মাঝে কড়ার আকৃতি নিয়ে ভ্যালি।

ওপরের পাহাড় থেকে তিনুনি আর অর্কদীপকে দুটি বড় দম-দেওয়া পুতুল বলে মনে হচ্ছে। আবার কখনো মনে হচ্ছে, ওরা আরব্য রজনীর কোন চরিত্র। দৈত্যপুরীর বন্দীদশা থেকে নিজেদের কোনরকমে মুক্ত করে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

ওরা অবশেষে এসে পৌঁছল ভ্যালির মাঝখানে। একটা ছোট্ট টিলাকে ঘিরে পাহাড়ী নদীটা বাঁক নিয়ে বয়ে চলে গেছে বিপাশার টানে। ঐ টিলার সঞ্চিত মাটি পাথর ভেদ করে উঠেছে তিনটে ছোট-বড় পাইন গাছ।

জলস্রোত ঠেলে টাট্টু দুটো এসে দাঁড়াল টিলার পাশে নুড়ি পাথর মাটি জমা এক টুকরো উঁচু জায়গায়। টাট্টু থেকে নামল দুজনে। তিনুনি বলল, ঠিক আমার পেছন পেছন উঠে এস টিলার ওপর। আলগা পাথরে পা পড়লে কিন্তু পাথর সমেত গড়িয়ে পড়তে পার নিচে।

অতএব একান্ত বাধ্য ছেলের মত তিনুনিকে অনুসরণ করে টিলার ওপর উঠে এল অর্কদীপ।

তিনটি পাইন টিলার গা ঘেঁষেই উঠেছে। ঐ পাইনের গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীলাভ একটি পাথর। পাইন গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে উত্তরে তাকালে অরণ্য-আচ্ছাদিত পর্বত দেখা যায়। তার পেছনে জেগে থাকে তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ।

অর্কদীপ বলল, একটা চমৎকার ল্যাণ্ডস্কেপ!

তিনুনি বলল, এটি আমি রঙ তুলিতে ধরে রাখার চেষ্টা করছি।

সাগ্রহে অর্কদীপ বলল, আমাকে দেখাবে?

স্টুডিওতে যখন যাব তখন দেখতে পাবে। ইচ্ছে হলে নিতেও পার।

আমাকে ছবির লোভ দেখিও না। ছবি কালেকশানের বাতিক আছে আমার।

না না, কালেকশানে রাখার মত ছবি আমার নয়। মনের

খুশীতে আঁকি।

তা হোক্, তোমার একটা ছবি অন্তত আমার কাছে থাক।

সে তোমার মর্জি। কতকগুলো ছবি তোমার সামনে রেখে দেব, যেটা খুশি নিও। আমি কিন্তু আঁকিয়ে হিসেবে আনাড়ি। মায়ের মত আর্ট কলেজের বড় বড় শিল্পীর কাছ থেকে ছবি আঁকা শিখিনি।

তোমার মায়ের হাতের একখানা ছবি আমাকে দেবে?

তুমি সোজাসুজি মায়ের কাছে তোমার প্রস্তাবটা রেখ।

অর্কদীপ দুষ্টুমিভরা মুখে তিন্নির দিকে তাকিয়ে বলল, এর চেয়ে বড় কোন প্রস্তাব হয়ত আন্টির কাছে রাখতে হতে পারে, তাই ভাবছি···।

তিন্নি প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে বলল, দেখ, কেমন সূর্য ডুবছে।

অর্কদীপ সহাস্যে বলল, আমার আশাও ডুবল। এরপর তো অন্ধকার।

তার মুখখানা পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তিন্নি বলল, দেখ দেখ, কি সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে।

ওরা দুজনে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের মাথায় চন্দ্রোদয় দেখতে লাগল।

যখন খানিকটা ওপরে উঠে চাঁদ ঝক্‌ঝক্ করছে তখন তিন্নি বলল, এসো আমরা বসি।

দুজনে মসৃণ একটা জায়গা দেখে বসে পড়ল।

অর্ক বলল, এই নীল পাথরখানা এখানে এলো কি করে?

আসলে অনেকদিন আগে বাবাই এ পাথরখানা দূর থেকে আনিয়ে ছিলেন।

কিছু উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চয়।

আমার বাড়িতে দরজার মাথায়,দেওয়ালের গায়ে যেসব পাথরের মূর্তি আছে, সেগুলো কি তোমার চোখে পড়েছে?

অর্ক উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, শুধু চোখে পড়া নয়, আমি ওগুলো দেখে অবাক হয়ে গেছি। নৃত্যরত গণেশ, সরস্বতী, সূর্য ও লক্ষ্মীর মূর্তি দারুণ। অতি দক্ষ শিল্পীর হাতছাড়া ওরকম মূর্তি

তৈরী করা সম্ভব নয়।

আমার বাবা ঐসব শিল্পীকে নিয়ে এসে বহু টাকা খরচ করে মূর্তিগুলি তৈরী করিয়েছিলেন।

এই নীল পাথরখানা দিয়ে কোন মূর্তি গড়াবার পরিকল্পনা নিশ্চয়ই তাঁর ছিল।

তিনুনি বলল তুমি ঠিকই ধরেছ। তবে খুব বেশী চেনাজানা কোন দেবদেবীর মূর্তি নয়।

তবে ?

আমার বাবা তো ডাক্তার ছিলেন, তাই তিনি দেব-বৈদ্য অশ্বিনী কুমারের একটি মূর্তি গড়তে চেয়েছিলেন।

অশ্বিনীকুমারের নাম শুনিনি।

অনেক প্রাচীন দেবতা। ওষুধ প্রয়োগ থেকে অপারেশন, চিকিৎসাশাস্ত্রের সবকটি শাখাতেই তাঁরা দুভাই ছিলেন সিদ্ধ। বাবা বলতেন, আজকাল শল্য চিকিৎসা যুগান্তর এনেছে। কিন্তু বেদ পুরাণ পাঠ করলে জানা যায়, এত প্রাচীনকালেও অপারেশনের ক্ষেত্রে তাঁরা অসাধ্য সাধন করতেন।

অর্ক বলল, পরিকল্পনাটি অভিনব ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমরা তাঁর নীল পাথরটাকে এখানে এনেছ কেন ?

আমার বাবা দূরে পাহাড়ের বস্তি থেকে রোগী দেখে ফেরার সময় এই টিলার ওপর উঠে বসতেন। তিনি মনে করতেন, এই তিনটে পাইন গাছ আমাদের সংসারের সিম্বল। আমরা তাই পাইনের কাণ্ডে হেলান দিয়ে পাথরখানাকে রেখেছি। বাবাকে এখানকার মানুষ অশ্বিনীকুমারের মতই মনে করত। বাবা বলতেন, অশ্বিনীকুমারের মত সার্জেন ত্রিভুবনে কোথাও নেই, তোমরা কার সঙ্গে কার তুলনা করছ।

পথচারীরা যাবার সময় এই টিলার দিকে তাকিয়ে পাথরখানাকে নমস্কার করে যায়।

কথাগুলো বলেই তিনুনি পাথরখানার ওপর হাত বুলোতে লাগলো পরম আদরে। একসময় সে মুখ তুলে তাকাল অর্কের দিকে। এক টুকরো অপ্রস্তুত হাসির আভা ফুটে উঠল তার মুখে।

অর্ক চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখল, তিন্নির দুটো চোখ অশ্রুতে চিক্চিক্ করছে।

ওরা দুজনে এবার বয়ে চলা ছোট্ট জলধারার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। চাঁদের আলোয় তখন রুপোলি পোশাক পরা জলপরী নাচছে।

অর্ক মৃদু গলায় ডাকল, তিন্নি···।

মুগ্ধ হয়ে চাঁদ আর জলের নৃত্যলীলা দেখতে দেখতে তিন্নির মনে হল, বহু দূরে স্বপ্নের জগৎ থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। সে ডাক পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে, হাওয়ার তরঙ্গে ভেসে ঐ স্রোতস্বিনীর জল ছুঁয়ে কানে এসে বাজছে।

ও মুখ তুলতেই দেখতে পেল অর্ক তার দিকে দুচোখের দৃষ্টি মেলে রেখেছে।

তিন্নি এই প্রথম কোন পুরুষের দৃষ্টির সামনে লজ্জা পেল। সে তার দৃষ্টি সোজাসুজি অর্কের দৃষ্টির সঙ্গে মেলাতে পারল না।

অর্ক এবার অসংকোচে তিন্নির একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর ধরে নিয়ে বলল, আমি কি এই হাতখানা ধরে অনেক অনেক দূরের পথ এগিয়ে যেতে পারি না?

এবার তিন্নির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সজাগ করে তুলল। না, একবার আবেগের স্রোতে ভেসে গেলে আর কোনভাবেই বিপরীত স্রোত ঠেলে ফেরা সম্ভব হবে না।

তিন্নি বলল, বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়ে যে হাত, তার শক্তি অসীম। সে সীমাহীন দূরত্ব পাড়ি দিতে পারে। তুমি আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু অর্ক। তোমার সঙ্গে নির্দ্বিধায় এ দুনিয়ার যে কোন জায়গায় ঘুরে আসতে পারি।

অর্ক যে অর্থে তিন্নির হাত ধরে দূর পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল তার সঠিক জবাব সে পেল না। কিন্তু নিরাশায় বিষণ্ণ হয়ে পড়ার মত উত্তরও যে সে পায়নি, একথা ভেবে সাময়িকভাবে আশ্বস্ত হল।

তিন্নি, তিন্নি,—কেউ ডাকছে বলে মনে হল।

তিন্নি শব্দের গতি লক্ষ্য করে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে অর্কদীপও।

মানুষটি ততক্ষণে টেনে টেনে নিজেকে এনে ফেলেছে নদীর ধারে।

তিন্নি 'ষাই' বলে শব্দ করে তার অস্তিত্ব আর অবস্থানটা জানিয়ে দিল।

দুজনেই টিলা থেকে নেমে টাট্টুতে চড়ে নদী পার হল।

ভাগ্তুরাম এবার ঝংকার দিয়ে উঠল, তোর জ্বালায় দেখছি একদিন আমাকে পথে পড়ে মরতে হবে।

ততক্ষণে টাট্টু থেকে নেমে পড়েছে ওরা।

তিন্নি ছুটে গিয়ে ভাগ্তুরামের গলাটা জড়িয়ে ধরে আদরে সোহাগে ভরে দিতে লাগল।

অর্কদীপের সামনে তিন্নি উচ্ছ্বাসে সোহাগ জানাচ্ছে দেখে ভাগ্তুরাম যথেষ্ট লজ্জা পেল। তিন্নি যখন তিন বছরের তখন থেকেই সে ভাগ্তুদাদার কাঁধে চেপে বিশ্বভ্রমণ করত। খোঁড়া মানুষের মাথাটি জড়িয়ে ধরে সে বসে থাকত কাঁধের ওপর। নাঃবার সময় মুখে মাথায় চুমু খেয়ে, অনেক আদর করে নামত। তাই আজও সপ্তদশী তিন্নি ভাগ্তুদাদার কাছে সেই তিন বছরেরটি থেকে গেছে।

তবু লজ্জা পেল ভাগ্তুরাম। হাজার হোক্, জজসাহেবের নাতির সামনে দেখাবার মত দৃশ্য এটি নয়। একান্ত নিজস্ব আনন্দ-ঘন মুহূর্ত এটি। শুধু দুজন অসম বয়সীর অনুভবের।

ভাগ্তুরাম গা ঝাড়া দিয়ে বলল, হয়েছে হয়েছে, চটপট বসে পড় দুজনে। খোঁড়া মানুষটাকে এ্যাদ্দুর ছুটিয়ে আনলি। নে, ব্যাগ খুলে খাবার বের করে খা। ফ্লাস্কে চা আছে।

তিন্নি ঝাঁঝিয়ে উঠল, কেন তুই কষ্ট করে আনতে গেলি? আমি তো মাকে বলেই এসেছিলাম, দেরী হলে চাটা খেয়ে নিতে।

আরে, তা কি হয়, মায়ের প্রাণ তো! তোদের জন্যে বিকেলের জলখাবার তৈরী করে সাজিয়ে বসে আছে।

তিন্নি বলল, জানো অর্ক, আমার মা রাজ্যের রান্না আর জল-

খাবারের বই কিনবে। সে সব কিচেনে তৈরীর পরে এক্সপেরিমেন্ট চলবে আমার ওপর দিয়ে। আর পারছি না মা, বললেও ছাড়ান নেই। আসলে খাবার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করলে আমি কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়ি।

অর্ক বলে উঠল, আরে আমার মাও ঠিক তাই। ছুটির দিনগুলোতে অবধারিত এ দেশীয় রান্না থাকবেই থাকবে। আর আমাকে তার বেশীর ভাগই খেয়ে তুলতে হবে। অবশ্য আমি হরেক রকম খাবার খেতেও ভালবাসি।

তিন্নি কিছু মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে ভাগ্তুরাম বলল, তোরা খাবি না বক্‌বক্‌ করবি? গরম খাবারগুলো জুড়িয়ে যে একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যাবে।

চাঁদের আলোয় ভাগ্তুর আনা একখানা কাগজ পেতে ওরা চায়ের আসর বসাল।

দুটো করে প্যাটিজ আর একটা করে কাজু দেওয়া বরফি।

তিন্নি ভাগ্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, তোর ভাগ কই ভাগ্তুদাদা?

থলের ভেতর থেকে আর একখানা প্যাকেট বের করে ভাগ্তু বলল, আছে, আছে। মা কি কখনো আমাকে না দিয়ে পারে।

কই দেখি?

ভাগতু প্যাকেট খুলবে না, তিন্নিও ছাড়বে না। শেষে তিন্নির জয় হল। সে ভাগ্তুর হাত থেকে প্যাকেটটা ছিনিয়ে নিয়ে খুলে ফেলল।

ভাগ্তুর প্যাকেটে দেওয়া হয়েছে দুটো মেঠাই আর একটা প্যাটিজ।

তিন্নি আনুনাসিক সুরে বলল, তোর ভাগে দুটো মেঠাই কেন?

তেমন দুটোর জায়গায় একটা প্যাটিজ।

আমার ভাগটা বদলে নিতে চাইলে তুই দিবি তো?

ভাগতু তার দাবি ছাড়তে নারাজ। সে বলল, মা যেমন বুঝেছে তেমনি দিয়েছে, আমি কোনকিছু চেয়ে নিইনি।

শেষে সবাই মিলেমিশে হাসি ঠাট্টার ভেতরে ভাগাভাগি করে খেল।

অর্ক লক্ষ্য করেছে ভাগ্তুরাম ডাক্তার মুখার্জীর বাড়ির একটি অ্যাসেট বিশেষ। মুখার্জী বাড়ির ভালমন্দের সঙ্গে সে জড়িয়ে আছে অচ্ছেদ্য বাঁধনে। ও বাড়ির পরিজনদের সে মনে করে তার রক্ত সম্পর্কের মানুষ। ঝিন্নিদেবী কিংবা তিন্নিও ভাগ্তুরামকে একান্ত আপনার জন বলেই ভেবে থাকেন। ঝিন্নিদেবী ভাগ্তুর অভিমানকে পুরো মর্যাদা দেন। তার বক্তব্যকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে দেখেন।

বছরে কেবল একটি দিন, কয়েক ঘণ্টার জন্য ভাগ্তু অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ডাক্তার মুখার্জী যখন ছিলেন তখন তিনি ভাগ্তুর মা বাবাকে ভেড়্ বকরী কেনার জন্য কিছু অর্থ দিতেন। কেউ যদি বলত, আপনি ওদের খোঁড়া ছেলের ভার বইছেন, তার ওপর আবার এতগুলো করে টাকা দিচ্ছেন কেন?

হেসে বলতেন ডাক্তার মুখার্জী, আমার মেয়ে জন্মাবার অনেক আগেই ভাগ্তু আমার কাছে এসেছে। ও আমার একটা ছেলে। ভাগ্তু খোঁড়া হলে কি হবে, একাই একশো। এজন্যে আমি ভাগ্তুর মা বাবার কাছে কৃতজ্ঞ। তাই অল্প কিছু অর্থ আমি তুলে দি ওদের হাতে। বুড়ো বয়সে কে ওদের খাওয়াবে। টাকাটা থাকলে, ভেড়্ বক্রী থাকলে শেষের দিনগুলো হয়তো মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারবে।

ভাগ্তুর বাবা মা যেদিন আসে সেদিন ও কেমন যেন উদাসীন হয়ে যায়। চলে যাবার পরেও যেন ওর ঘোর কাটতে চায় না। বিপাশার কূলে কূলে, পথে প্রান্তরে, বনের গহনে ও আপন মনে অন্তত তিন চার দিন ঘুরে বেড়ায়।

ও যখন ছোট ছিল তখন বাবা মার সঙ্গে ঘুরে বেড়াত পাহাড় পর্বতে, বনে বনে, নতুন নতুন বুগিয়ালে (চারণভূমি)। পাহাড়ী ঝর্ণার কূলে বসে তার ছোট্ট বাঁশুরিতে ফুঁ দিত। পাশেই সবুজ ঘাসের চারণক্ষেত্রে ফোটানো দুধ রঙের ভেড়াগুলো চরে বেড়াত।

রাতে ঐ বুগিয়ালের ওপর ভেড়াদের মাঝখানে চিৎ হয়ে শুয়ে ও তারা গুনতো।

আজ কত যুগ হল, সেই সব দুর্গম তুষার পাহাড়ের কোলে ঝর্ণার ছোঁয়া লাগা ঘাসের জমিনে পা ফেলে ফেলে সে ঘুরে বেড়ায়নি। তাই মা বাবাকে দেখলেই তার মনে পড়ে যায়, সেই সব স্বপ্নের দিনের কথা।

জলখাবার খেয়ে ওরা তৈরী হল বাড়ি ফেরার জন্য।

অর্ক বলল, এবার আমার টাট্টুতে চড়বে ভাগ্‌তুদাদা।

ভাগ্‌তুরাম চেঁচিয়ে উঠল, খোঁড়াকে ঘোড়ার লোভ দেখাচ্ছ? আমি দিব্যি হেঁটে যেতে পারব। খোঁড়া মানুষ ঘোড়ায় উঠলেই পড়ার ভয় থাকবে সব সময়।

আমি তোমার পাশে পাশে চলব। তোমাকে ধরে ধরেই নিয়ে যাব।

হা হা করে হাসি উড়িয়ে ভাগ্‌তুরাম বলল, তাহলেই হয়েছে আর কি। এখন ঘোড়ায় উঠলে পতন ঠেকাতে ঠেকাতে কাল সন্ধ্যে নাগাদ বাড়ি পেঁছিব।

তিন্‌নি বলল, আমার কাছে একটা সমাধান আছে।

ভাগ্‌তু বলল, কি রকম?

আগে বল, মেনে নেবে?

আচ্ছা বাবা মানব।

আমরা পাঁচজন হেঁটে যাব।

ভাগ্‌তু বলল, হেঁটে যাব বুঝলাম, কিন্তু তোর পাঁচজন কোথায়?

তিন্‌নি বলল, কেন, ঘোড়া দুটোকে ফেলে যাব নাকি? ওরাও হেঁটে হেঁটে যাবে আমাদের সঙ্গে।

রাত ন'টা নাগাদ অর্ককে জজসাহেবের জিম্মায় রেখে দিয়ে ওরা বাড়ি ফিরল। ঝিন্নিদেবী জানালা দিয়ে ওদের ফিরতে দেখে আশ্বস্ত হলেন।

ডাক্তার মুখার্জীর মৃত্যু হয়েছিল, ঐ ভ্যালির মধ্যে পড়ে। মুখার্জী সাহেব বড় ভালবাসতেন ঐ ভ্যালিটিকে। ঐ ভ্যালির

ভেতর দিয়ে বয়ে চলা ছোট্ট নদী, তার চারদিকে সবুজ পাইন বনে ছাওয়া পাহাড়শ্রেণী, উত্তরে ঝকঝকে তুষার পর্বত তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলত। তিনি অনেক সময় জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রে টাট্টুতে চড়ে নিশি পাওয়ার মত ভ্যালির চারদিকে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো বা টিলার ওপর বসে শত বার দেখা আকাশের নক্ষত্রগুলির দিকে তাকিয়ে আবার নতুন করে পরিচয় করতেন।

কোনদিন অধিক রাত্রি হলে উদ্বিগ্ন ঝিন্নিদেবী স্বামীর খোঁজে পাঠাতেন ভাগতুকে। ওঁরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি এমনি করে বসে থাকতেন জানালার ধারে।

ডাক্তার মুখার্জীর ভ্যালিতে পড়ে মৃত্যুর পর থেকে ঝিন্নিদেবী আপনজন কাউকে ভ্যালির ভেতর দিয়ে যাওয়া আসা করতে দেখলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন।

আজও তিনি তিনুনিদের ফেরার পথের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। এখন তাদের ফিরতে দেখে আশ্বস্ত হলেন।

পরের দিন সকাল থেকে বিকেল মায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঘর গোছানোর কাজে কাটিয়ে দিলে তিনুনি। প্রথম মানালীতে পেঁছেই ক্যারলদের দলটি উঠবে ডাক্তার মুখার্জীর বাড়ি-সংলগ্ন বাগানের প্রান্তে অতি সুন্দরভাবে সাজানো আউট হাউসটিতে। নিচে আর ওপরে দুখানা করে চারখানা রুম। নিচের দুটি রুমের মাঝে লম্বায় ও চওড়ায় বিশাল ডাইনিং কাম ড্রইং রুম। পেছনে কিচেন। প্রতি রুমের সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথ।

নিচের ড্রইং কাম ডাইনিং রুমের স্পেসটা ওপরে গিয়ে বেশ বড়সড় একখানা লাইব্রেরীতে রূপ নিয়েছে।

ওপরে কিংবা নিচে কোন মূর্তি নেই। সব কটা ঘর ঝিন্নিদেবীর পেইন্টিং দিয়ে সাজানো। নিচে বেশ বড় লন। সবুজ ঘাসের বেডের ওপর প্যাটার্ণ করা নানা রঙের ফুলের কেয়ারি। মাঝে মাঝে কাচের টপওয়ালা টেবিলের চারদিকে লাল গদী আঁটা সাদা রঙের বেতের চেয়ার পাতা। রোদ পোহানো, ম্যাগাজিন পড়া, চা-পান কিংবা বসে বসে তুষার-দৃশ্য দেখার উপযুক্ত স্থান এগুলি। এদের নীরব

আমন্ত্রণ অতিথিদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করে।

ঠিক সন্ধ্যায় ঝলমল করে উঠল ছবিঘরের ঝাড়লণ্ঠন। বর্ণালির ভেতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে সে আলো সৃষ্টি করল সাত রঙের ইন্দ্রধনু।

সেই আলো লক্ষ্য করে রহস্যঘন বনপথ ধরে উঠতে লাগল একটি যুবক। কস্তুরী গন্ধে বিহ্বল কোন একটি মৃগ যেমন করে কাঙ্ক্ষিত মৃগীর সন্ধানে বনপথ অতিক্রম করে।

নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পেঁাছে দুটি বিশাল বাহু প্রসারিত করে খোলা দরজার পাল্লা ছুঁয়ে দাঁড়াল সে।

আজ ওর সী-গ্রীন টি-শার্টের বুকে গাঢ় হলুদে লেখা—'ফ্রেণ্ডশিপ ইজ দ্য ওয়াইন অব লাইফ'। বন্ধুত্ব জীবনের অমৃত রসায়ন।

ছবি থেকে মুখ তুলল তিন্নি। অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমায় ধরা তুলি সমেত হাতখানা গালে ঠেকিয়ে কিছু সময় তাকিয়ে রইল আগন্তুকের দিকে। বুকের লেখাটি পাঠ করার পর ওর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হল।

অর্ক, ফ্রেণ্ডশিপ ইজ ওয়ান মাইণ্ড ইন টু বডিজ।'

অর্কদীপ চমকে উঠে বলল, অসাধারণ।

'বন্ধুত্ব হল, দুটি দেহে একটি মাত্র মন।' যেন যৌবনের সোনার সুতোয় বাঁধা।

অর্কদীপ ঘরে ঢুকে এল। বলল, তোমার আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই ঢুকে পড়লাম তিন্নি।

বন্ধু কি আমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে অর্ক? তার জন্য প্রবেশের দ্বার চিরদিনই খোলা থাকে। গৃহে এবং মনে।

অর্ক বলল, আণ্টির কাছে শুনেছিলাম তুমি খুব চুপচাপ থাকতে ভালবাস, কিন্তু আমার ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত।

তিন্নি বলল, অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া সবার কাছেই আমি চুপচাপ থাকতে ভালবাসি।

তুমি যখন কথা বল তখন সেটা কবিতা অথবা দর্শন হয়ে ওঠে।

অর্ক, আমাকে ওভাবে দেখো না, আমি অতি সাধারণ মেয়ে।

কিছু লেখাপড়া করি, ছবি নিয়ে মেতে থাকি। এতেই আমার আনন্দ। এই যে তোমার সেই ছবি, যা আমি ঐ টিলার থেকে দেখে এঁকেছিলাম। এই সন্ধ্যায় ছবিটির তুষার-শৃঙ্গে ভোরের আলোর রঙ লাগিয়ে দিয়েছি। ইচ্ছে হলে তুমি এটি নিতে পার। বন্ধুর উপহার হিসেবে।

আজ সন্ধ্যায় আমার এই ছবিঘরে আসা সেই লোভেই তিন্নি।

এবার একমুখ হাসিতে ঘরখানা ভরিয়ে দিয়ে তিন্নি বলল, তুমি তাহলে শিল্পীর চেয়ে তার শিল্পকেই বেশী ভালবাস?

শিল্পের ভেতরেই তো শিল্পী থাকেন তিন্নি, তাঁকে আলাদা জায়গায় খুঁজতে গেলে কখনো কি পাওয়া যায়?

তুমি ঠিকই বলেছ অর্ক, আমাদের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে ভাস্কর্যের যে অপূর্ব সব নিদর্শন রয়েছে তার কোথাও শিল্পীর নাম নেই। তবু তাঁরা আছেন, এবং থাকবেনও বহুকাল, যতদিন না তাঁদের শিল্পকর্মগুলি মহাকাল গ্রাস করে ফেলে।

অর্ক বলল, আমার সামনেই কিন্তু শিল্পী তার অপূর্ব শিল্পকর্মটি নিয়ে বসে রয়েছে। আমি অভিন্ন দুটিকেই গভীর ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করতে চাই।

আবার হাসির তরঙ্গ তুলল তিন্নি। বলল, এক শিল্পব্যবসায়ী একদিন ঢুকেছিল এক শিল্পীর স্টুডিওতে। তাকে মহিলা শিল্পীটি যে ছবিই দেখান, সেটিই তার পছন্দ হয়ে যায়। কিন্তু ছবির দাম যে আকাশছোঁয়া! তাই ব্যবসায়ীটি ভাবল, শিল্পীটিকে কিনে নেওয়াই লাভজনক। একে দিয়ে আরও অনেক ছবি আঁকানো যাবে, লাভও হবে প্রচুর।

তারপর?

তারপর প্রস্তাবটি শুনেই সঙ্গে সঙ্গে পাগলা গারদের সুপারিনটেন্ডেন্টকে ফোন করেছিলেন শিল্পী।

অর্ক অমনি বলে উঠল, তোমার এখানে কোন ফোনটোন নেই তো?

এবার উচ্চ হাসির শব্দে খান খান হয়ে গেল অন্ধকার বনভূমির

নীরবতা।

তিনুনি উপহার হিসেবে তার আঁকা ছবিটি তুলে দিল অর্কের হাতে।

সারি সারি পাইনে ছাওয়া পাহাড়। তার পেছনে উঁকি দিচ্ছে বরফের মুকুটপরা পর্বত। শ্বেত মুকুটের গায়ে সোনার কাজ। অনেক নিচে পাহাড়ের তলায় টাট্টুতে বসে একটি মানুষ। নির্নিমেষ চেয়ে আছে সোনার কাজ করা মুকুটটির দিকে।

অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকে অর্ক বলল, আমার সংগ্রহে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি হয়ে থাকবে।

তুমি তোমার বন্ধুকে ভালবাস, তাই এ মর্যাদা।

বিশ্বাস কর, ছবিটিও আমার চোখ আর মনকে টেনেছে। ভোরের আলোর ছোঁয়ায় রাতের জমে থাকা নীলাভ হিমেল কুয়াশার ওড়াউড়ি সমস্ত নিসর্গকে জীবন্ত করে তুলেছে।

তিনুনি বলল, তোমার যে ছবি দেখার আলাদা একটা চোখ আছে তাই জেনে আমি আজ বড় তৃপ্তি পেলাম। এটা আমার কাছে মস্ত বড় একটা পুরস্কার।

সামান্য ছোট্ট একটি পুরস্কার এরই সঙ্গে আমি তোমাকে দিতে চাই তিনুনি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তিনুনি অর্কের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অর্ক তার পকেট থেকে একটি চমৎকার লাল কাস্কেট বের করে তিনুনির হাতে তুলে দিল।

তিনুনি বলল, কি আছে এতে?

খুলে দেখ।

বেশ কৌতূহল নিয়ে তিনুনি কাস্কেটটা খুলল। মেরুন রঙের একটা গোল্ডেন ক্যাপওয়ালা লেডিজ সেফার্স, তার সঙ্গে একই কালারের একটি ডট পেন।

এমব্রয়ডারির সুতোয় গাঁথা একটি ছোট্ট ফুলের স্তবক আঁকা কার্ডে লেখা আছে,—আমার প্রিয় বান্ধবীর জন্যে।

দারুণ খুশী হলাম তোমার এত সুন্দর একটা উপহার পেয়ে। আমার প্রিয় বস্তুগুলোর ভেতর পেন একটি। নানা রঙের পার্কার,

সেফার্স রয়েছে আমার সংগ্রহে। তাছাড়া মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক, এভার-সার্পও রয়েছে। উইংসাঙ্ দিয়ে আমি চিঠিপত্রের কাজ চালাই। মোটা নিবের একটা সেফার্স আছে। ওটি আমার পয়া পেন। পরীক্ষায় প্রতিবারই ও আমাকে উদ্ধার করে দেয়।

অর্ক বলল, প্রেমপত্রগুলোও কি উইংসাঙে লেখ নাকি?

তিন্নি ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে অর্কের চুল ধরে নাড়া দিল।

অর্ক দারুণ মজা পেয়ে বলল, সত্যি করে বলই না?

তিন্নি আবার ঝাঁকুনি দিয়ে এলোমেলো করে দিল অর্কের একরাশ চুল।

অর্ক এবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমার পকেটে কিন্তু চিরুনি নেই।

তিন্নি সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাগ থেকে একটা চিরুনি বের করে নিজেই অর্কের এলোমেলো চুলগুলো আঁচড়ে দিতে লাগল।

এবার চুল নিয়ে শুরু হল তিন্নির খেলা। সিধে সিঁথে, বাঁকা সিঁথে, ব্যাক ব্রাশ, সব রকম করে সে দেখতে লাগল অর্ক-দীপের মুখখানা। চুলের কোন্ ভঙ্গীতে মুখের শ্রী বেশী খোলে তারই পরীক্ষা চলল কতক্ষণ। বাঁ হাতে অর্কের থুতনি তুলে ধরে দেখল। বাঁদিকে, ডানদিকে মুখখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

অর্ক নীরব। সে ঠিক একটি পুতুলের মত ঘাড় থেকে মাথাটি নেড়ে চলেছে।

কতক্ষণ পরে অর্কের স্থির মুখখানা নিজেই ঘাড় ঘুরিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে দেখল তিন্নি। তারপর সহাস্যে মন্তব্য করল, একেবারে ডেভিডের মুখখানা। তোমার দেহের গঠনটাও সেরকম। আর্টিস্টের দৃষ্টিতে তুমি অনেক দামী মডেল।

অর্ক বলল, এই প্রথম একজন মহিলা-শিল্পী আমাকে আবিষ্কার করল।

দুষ্টুমির হাসি হেসে তিন্নি বলল, এতদিন আমেরিকা মহাদেশে একজনও মহিলা তোমাকে আবিষ্কার করেননি, এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে বল?

আমি তো মহিলার কথা বলিনি, মহিলা-শিল্পীর কথা বলেছি। দুজনের ভেতর অনেক পার্থক্য আছে তিনুনি।

বুঝেছি, তুমি আবিষ্কৃত হলেও কোন শিল্পীর দ্বারা নও।

এবার বিশ্বাসের প্রশ্ন এল তিনুনি। আমেরিকার মত দেশ; যেখানে ফ্রি-মিক্সিং রেওয়াজ, সেখানে একজন স্বাস্থ্যবান চাকুরীজীবি যুবক কোন যুবতীর সান্নিধ্যে আসেনি, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার ক্ষেত্রে ঐ অবিশ্বাস্য ঘটনাটিই ঘটেছে। আর এটি ঘটেছে আমার মায়ের জন্যে।

তোমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমার কৌতূহলী হয়ে ওঠাটা বোধ হয় সাজে না অর্ক।

শুনতে আপত্তি থাকলে অবশ্য অন্য কথা, কিন্তু আমার বলতে কোন বাধা নেই।

তোমার মায়ের প্রসঙ্গ তুলেছ তাই আগ্রহ বেড়েছে আমার।

শোন তাহলে। মা একদিন আমাকে কাছে ডেকে বলল, তুমি বড় হয়েছ, এখন জীবনটাকে নানাভাবে ভোগ করার সময় এসেছে তোমার।

আমি বললাম, তুমি কি আমার বিয়ের প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাইছ?

মা বলল, ঠিক তাই।

বল কি বলবে?

তুমি আমেরিকাবাসী কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে আমার কোন আপত্তি নেই। এখানকার সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে তোমাকে থাকতে হবে। আবার তুমি যদি ভারতীয় কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চাও তাতেও আমি খুশী হব। এখন নির্বাচন তোমার।

আমি বললাম, মা, আমেরিকায় আমার জন্ম। শিক্ষাদীক্ষা চাকরি সবই এখানে। কিন্তু আমার পূর্বপুরুষরা ইণ্ডিয়ান। আমার রক্তে তাঁদের সংস্কার মিশে আছে। আমি ভারতীয় কোন মেয়েকে সঙ্গী হিসেবে পেলে সবচেয়ে সুখী হব।

মা বলল কি জান?

কি ?

তাহলে কোন বান্ধবীর সঙ্গে উইক এণ্ড কাটানোর পরিকল্পনা বাতিল কর।

বললাম, কথা দিচ্ছি মা।

তিনি হেসে বলল, তাই ইণ্ডিয়াতে এসেছ বউ খুঁজতে ?

যেমন খুশি ভাবতে পার।

এবার সত্যি করে বলতো, আমেরিকা থেকে আসার সময় কার কথা মনে করে পেন-সেট্‌টা এনেছিলে ?

তোমার মত কোন মেয়ের দেখা পেলে তার হাতে তুলে দেব ভেবেছিলাম।

সেণ্ট পার্সেন্ট সত্যি ?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভার তোমার ওপর।

তিনি অন্যদিকে কথা ঘোরাল, মাঝখানে সিঁথি করে দেওয়ায় তোমার বিপুল চুলের ঢাল দুদিকে ভাগ হয়ে গড়িয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে, কোথায় যেন কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের যৌবনের একটা ছবি দেখেছিলাম। সেখানেও বিপুল চুলের মাঝখানে এমনি সিঁথি কাটা ছিল।

অর্ক বলল, আমার চুলের ওপর তোমার এত নজর কেন ?

এমন ঘন আর সুন্দর চুল সচরাচর দেখা যায় না বলে। একবার উঠে দাঁড়াও তো।

অর্ক হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল। তার মনে হল, নির্মল খুশীর মেজাজে ঠাসা এই মেয়েটি। নিরীহ ফুলঝুরিটির মত চুপচাপ পড়ে থাকে, কিন্তু সামান্যতম আগুনের ছোঁয়া পেলেই চারদিকে আলোর তারাফুল ছড়ায়।

এবার তিনি অর্কদীপের হাত ধরে তার ছোট্ট ড্রেসিং রুমের ভেতর নিয়ে গেল। প্রমাণ সাইজ একখানা আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, এখন নিজের রূপটি চিনে নাও। সামনেই চিরুনি পাবে, হেয়ার স্টাইল পছন্দ না হলে চুল ভেঙে নিজের মত করে নেবে। আমি বাইরে অপেক্ষায় রইলাম, তোমাকে স্বাগত জানানোর জন্যে।

ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে নিজের আঁকার চেয়ারে বসে রইল তিনানি।

কিছু পরে তিনানির সামনে এসে দাঁড়াল অর্ক। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।

তিনানি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, পছন্দ?

খু-উ-ব।

ভয়ে তো সিঁটিয়েছিলে, কি জানি কি হয়ে গেল।

এবার থেকে অর্কদীপ চতুর্বেদীর এই হেয়ার স্টাইলই বজায় থাকবে।

তিনানি সঙ্গে সঙ্গে হাত পাতল।

সে হাতখানা ধরে ফেলল অর্ক।

বল, আমি কি দিতে পারি তোমাকে?

তিনানি বলল, গোটা কয়েক সিটিং।

তুমি সত্যিই আমাকে মডেল করবে নাকি?

তোমার ইচ্ছে।

আমি তো তাহলে অমর হয়ে যাই।

তিনানি বলল, মডেল হবার আগে ভাববে, তুমি মিকেলাঞ্জেলো অথবা পিকাসোর মডেল নও, নিতান্ত একজন নবিসের খামখেয়ালীর খেলনা।

ওতেই আমার খুশীর অন্ত নেই।

চার

প্রতিদিন ব্রেকফাস্টের পর ওরা দুজনে হাজির হয় ছবিঘরে। মহা উদ্যমে শুরু হয়ে যায় ছবি আঁকার কাজ। দুজনেরই উন্মাদনার শেষ নেই।

বড় নির্জনে নিভৃতে তাদের কাজ শুরু ও শেষ হয়।

একমাত্র ভাগতুরামই জানে তাদের এই নতুন পরিকল্পনার কথা। কারণ একাধারে ভাগতু তিনানির ভাই, বন্ধু ও পরামর্শ-দাতা। সে তিনানির প্রয়োজনের জিনিস ভূ-ভারত ঢুঁড়ে সংগ্রহ

করে আনে।

তিনুনির অন্যায় ভাগতু বরদাস্ত করে না, তিনুনির চোখের জলও সে সইতে পারে না।

তিনুনি ভাগুতুকে বলেছিল, আমি অর্ককে মডেল করে কয়েকটা ছবি আঁকতে চাই। আর সে ছবিগুলো যদি মনের মত হয় তাহলে তাই দিয়ে জুলিয়েন আঙ্কেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে একটা এগ্‌জিবিশান করব। তুই কি বলিস?

দারুণ হবে। ক্যারলদের আসার আগে কাজ শেষ করতে পারবি?

চেষ্টা করব। আর ওদের থাকাকালীন এগ্‌জিবিশানটা করতে চাই।

মাকে বলেছিস?

তুই আমি আর অর্ক ছাড়া কেউ জানে না।

মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিড, সে এক অবিস্মরণীয় ভাস্কর্য! বলিষ্ঠতার সঙ্গে কোমলতার এমন অভাবনীয় মিলন ভাস্কর্যের ইতিহাসে বিরল।

ডেভিড সম্পূর্ণ নগ্নমূর্তি। নগ্নতার মাধুর্য যে দর্শকের মন ও দৃষ্টিকে কতখানি একাগ্র করে তুলতে পারে তার প্রমাণ ডেভিড। মূর্তির পেশী, শিরা-উপশিরা, মণিবন্ধ থেকে করতল, অঙ্গুলির অর্ধ আকুঞ্চিত বিন্যাস পুঞ্জীভূত শক্তিকেই যেন প্রকাশ করছে। চোখে মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাবটি পরিস্ফুট, কিন্তু মুখ ও ললাটের রেখায় কোন কঠিনতার কুঞ্চন নেই।

'ল্যাণ্ডমার্কস অব দ্য ওয়ার্লড্‌স্ আর্ট' সিরিজের 'দ্য ক্ল্যাসিকেল ওয়ার্লড্' বইখানা মায়ের শেল্‌ফ থেকে বের করে এনে অর্কের হাতে তুলে দিল তিনুনি।

ডেভিডের মূর্তিখানা দেখ। কিভাবে দাঁড়াবে, মনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে কিভাবে রূপ দেবে তা ঐ ভাস্কর্যের ভেতর থেকে বুঝে নাও।

আমাদের গেস্ট হাউসের লাইব্রেরীতে বাইবেল আছে। তার থেকে ইসরায়েল ও পলেস্তিয়দের যুদ্ধের ইতিহাস এবং তার ভেতর

ডেভিডের ভূমিকাটা দেখে নিও। তরুণ মেষচারক ডেভিড কিভাবে একটামাত্র পাথর ছুঁড়ে দৈত্যের মত আকৃতিবিশিষ্ট গলিয়েতকে ধরাশায়ী করেছিল, সে বিবরণ পাবে। ভাগতু দাদার কাছে সব ঘরের চাবি আছে, চেয়ে নিও দরকার মত।

সেই সঙ্গে আর একখানা বই নিও, 'লিজেণ্ডস্ অব গ্রীস অ্যাণ্ড রোম'। তার ভেতর থেকে 'ইকো-নার্সিসাস', 'অরফিউস-ইউরিডাইস,' 'দ্য কুইন হানট্রেস অ্যাণ্ড আ বোল্ড হানটার' গল্পগুলো পড়ে নিও। ওগুলোর প্রধান পুরুষ চরিত্রে তোমাকে অভিনয় করতে হবে। ঠিক অভিনয় নয়, জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমি তোমাকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আঁকব।

প্রথম দিন, মেষচর্মের আচ্ছাদনে কটিদেশ জড়িয়ে ডেভিডের ভূমিকায় দাঁড়াল অর্ক। একেবারে নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে তার সংস্কারে বাধলো। সেজন্যে ভাগতুরামকে বলে আগেভাগে তিন্নি তৈরী করিয়ে রেখেছিল এই পোশাকখানা। তাই পরে শিল্পীর সামনে ডেভিডের যথাযথ ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে লাগল অর্ক।

তিন্নি এখন মগ্ন। সে স্কেচ করল দ্রুত হাতে। রঙ দেবার সময় দেখল, অর্ক সত্যিই ডেভিডে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ তাকে মুগ্ধ চোখে দেখল তিন্নি। তারপর বলল, তুমি এখন রিলাক্স্ কর চেয়ারে বসে। দরকার হলেই আমি তোমাকে আবার ডাকব।

দু'তিনবার সিটিং দিতে হল। পরের দিন অর্ককে ছুটি দিয়ে দিল তিন্নি।

বলল, কাল তুমি নানা নানির আদর খেও। আমি একা বসে রঙের কাজ সারব।

ঝিল্লিদেবী বলেন, তিন্নির নিবিষ্টতা তাঁর চেয়েও বেশী। আর মুড এলে অতি দ্রুততার সঙ্গে নিখুঁত নৈপুণ্যে কাজ সেরে ফেলতে পারে। ওর দোষ হল, নিরন্তর অনুশীলনের অভাব। উন্নতির মূলে ক্রমাগত অনুশীলন। ভাল না লাগলেও অনেক সময় নিজেকে শাসন করে কাজে বসতে হয়।

তৃতীয় দিনে ডেভিড তৈরী হয়ে গেল।

মিষ্টি একটা ব্লুইস গ্রীনের ব্যাক গ্রাউন্ড। সেই কালারের শেডে শ্বেতপাথরের তিন ফুট পরিমাণ একটা মূর্তি জেগে উঠেছে। পাথর নয়, যেন জীবন্ত ডেভিড নামের এক অপার শক্তিশালী তরুণ হাতের নুড়িটি ছোঁড়ার জন্য উদ্যত। ডেভিডের মুখে অর্ক কিংবা মিকেলাঞ্জেলোর সৃষ্টির বিশেষ কোন ছাপ নেই। এ যেন চিরদিনের ভ্রাম্যমান কোন মেষচারক তরুণের মুখ, যে তার স্বাভাবিক শক্তি সঞ্চয় করেছে উন্মুক্ত প্রান্তরের রৌদ্র, জল, ঝঞ্ঝা থেকে। চারণভূমির সবুজ লাবণ্য তাকে বাঁচিয়েছে প্রকৃতির রূঢ়তা থেকে।

শক্তি আর লাবণ্যে পূর্ণ একটি প্রাণ যেন জেগে উঠেছে ঐ অবয়বে।

অদূরে অনেক ছোট আকারের কতকগুলো বর্শাধারী মূর্তি। তাদের সামনে আকারে ছোট হলেও ভীষণ আকৃতির গলিয়েতের কালারফুল ছবি।

শিল্পী বোঝাতে চেয়েছে, আকৃতি যত ভয়ংকরই হোক স্বাভাবিক শক্তিতে পূর্ণ একটি মানুষের কাছে সে একটি পিগমি বা বামন ছাড়া কিছু নয়।

ছবি দেখে অর্ক মুগ্ধ।

তিনুনি বলল, তোমার ঋজু বলিষ্ঠ অবয়ব ওতে ধরা পড়েছে, কিন্তু মুখে তোমার আদল নেই। ইচ্ছে করেই আমি তা রাখিনি। আমি ডেভিডের মুখখানা অনন্ত যৌবনের প্রতীক হিসেবে গড়তে চেয়েছি।

এরপর একটি একটি করে গড়ে উঠতে লাগল নার্সিসাস, অরফিউস, অ্যাক্টিয়নের ছবি।

ইকো অতি সুন্দর স্বভাবের একটি মেয়ে। সে গল্প করতে পারত ভারি চমৎকার। তার গল্প শোনার জন্য ভীড় জমে যেত। এই গুণটিই শেষ পর্যন্ত তার কাল হল। ইকো বা প্রতিধ্বনির কথা বলার শক্তি এমনি আকর্ষণীয় ছিল যে তার টানে স্বর্গের দেবতা জুপিটার পর্যন্ত তার আসরের শ্রোতা হয়ে গেলেন।

এসব দেখে শুনে জুপিটারের স্ত্রী জুনো এমনি ক্ষিপ্ত হয়ে

গেলেন যে তিনি ইকোর কথা বলার শক্তিই হরণ করে নিলেন। অবশ্য কেউ কোন কথা বললে ইকো তার শেষ শব্দটি কেবল উচ্চারণ করতে পারত।

ইকো লজ্জায় দুঃখে লোকালয় ছেড়ে গভীর বনের ভেতর আত্মগোপন করল।

এদিকে নার্সিসাস অতি সুদর্শন এক যুবা পুরুষ। সে শিকার করতে ভালবাসত। কারু প্রতি কোন আকর্ষণ সে বোধ করত না।

একদিন নার্সিসাস বন্ধুদের সঙ্গে বনে শিকারে গিয়ে পথ হারিয়ে বিপথে চলে গেল। সে ক্রমাগত বন চিরে চিরে সঠিক পথের সন্ধান করতে লাগল।

ঐ বনেই থাকত ইকো। সে দূর থেকে নার্সিসাসকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। সে তাকে অনুসরণ করছিল, কিন্তু সাহস করে কাছে এগিয়ে যেতে পারছিল না।

এক সময় নার্সিসাস চিৎকার করে বন্ধুদের ডাক দিল, তোমরা কেউ আছ এখানে?

অমনি ইকো শেষ অক্ষরটি উচ্চারণ করল,—'এখানে।'

নার্সিসাস ভেবেছিল, সে বনে নিঃসঙ্গ ঘুরে মরছে। কিন্তু মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে সে অনেকটা আশ্বস্ত হল। কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে বলল, এসো।

অমনি ইকো উচ্চারণ করল, 'এসো।'

নার্সিসাস আরও অধীর হয়ে ডাক দিল,—'এসো, আমরা এখানে মিলিত হই।'

ইকো এবার পত্রান্তরাল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে উত্তর করল, 'মিলিত হই।'

সে এখন প্রবল আবেগে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল নার্সিসাসকে। এইভাবে সে তার মনের ইচ্ছাকে প্রকাশ করল।

কিন্তু নার্সিসাস কারু রূপের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না। সে ইকোকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বন চিরে এগিয়ে গেল। ইকো দুঃখে, অপমানে, লজ্জায় ভেঙে পড়ল কান্নায়। কিন্তু সে ভুলতে

পারল না নার্সিসাসকে।

এদিকে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে নার্সিসাস এলো একটি স্বচ্ছ জলাশয়ের ধারে। সে জলপানের জন্য শায়িত অবস্থায় মুখ নিচু করে হাত বাড়াল।

আশ্চর্য! এ কে! এমন অপূর্ব সুন্দর মুখ সে আগে কোন দিনই দেখেনি। নার্সিসাস ভুলে গেল জলপানের কথা। সে নির্নিমেষ চেয়ে রইল ঐ মুখের দিকে। এমন প্রেমের স্বাদ সে আর কখনো পায়নি।

হাত দিয়ে ছুঁতে গেলেই জলে তরঙ্গ ওঠে। সুন্দর মুখ হারিয়ে যায়। আবার জল স্থির হলে মুখ জেগে ওঠে। নার্সিসাস হাসলে সেও হাসে। নার্সিসাসের বেদনার ছবি সে মুখেও ফোটে।

দিনের পর দিন নার্সিসাস তার দিকে চেয়ে থাকে, তাকে পেতে চায়, কিন্তু অধরা অধরাই থেকে যায়।

দূরে থেকে দুখিনী ইকো সব কিছুই লক্ষ্য করে। সে বেদনায় ধীরে ধীরে দেহহীন হয়ে যায়।

এমনি করে অনাহারে অনিদ্রায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় জীবনের দীপ নিভে গেল নার্সিসাসের।

একদিন দেখা গেল, যেখানে নার্সিসাসের মৃতদেহ পড়েছিল সেখানে একটি ফুল ফুটেছে। জলের দিকে তাকিয়ে সে দেখছে নিজেকে। সাদা নরম পাপড়িওলা ফুল, মাঝে উজ্জ্বল সোনালী রঙের প্রভা।

গল্প বলা শেষ হলে অর্কের মুখের দিকে তাকাল তিন্নি।

অর্ক বলল, বুঝেছি, আমাকে নার্সিসাসের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। কিন্তু আমি নার্সিসাস নই। আমি কখনো ইকোর মত কোমল মনের একটি নারীকে পরিত্যাগ করতাম না।

তিন্নি বলল, তোমার স্বভাবের ভেতর কোমলতা আছে আর দৃষ্টিতে আছে সহানুভূতির ছোঁয়া, কিন্তু বন্ধু খুব চিন্তা করে দেখো, আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই এক একজন নার্সিসাস ঘুমিয়ে আছে। গল্পের নার্সিসাসের মত হয়ত আমরা এমন উৎকটভাবে

অন্যকে উপেক্ষা করে নিজেকে উন্মাদের মত ভালবাসি না, কিন্তু প্রায় প্রতিটি মানুষ নিজেকে সব থেকে বেশী ভালবাসে।

অর্ক বলল, তোমার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই তিনুনি।

তাহলে কাল থেকে তুমি নার্সিসাস।

তুমি নার্সিসাসের কোন্ অধ্যায়টি নিয়ে ছবি আঁকবে? ইকোকে প্রত্যাখ্যানের পর্ব না নিজেকে ভালবাসার পর্ব?

এ কি বলার অপেক্ষা রাখে অর্ক? নিঃসন্দেহে নার্সিসাসের নিজের প্রেমে মগ্ন হবার বিষয়টি নিয়েই ছবি আঁকব।

একটি বিশাল আয়না মেঝেতে পাতা হয়েছে। তার দিকে ঝুঁকে পড়ে নিজের প্রতিকৃতি প্রথম দেখছে নার্সিসাস। একটা বিস্ময় ছড়িয়ে পড়েছে তার চোখেমুখে। এত সুন্দরও কি ত্রিভুবনে কেউ হতে পারে।

এই প্রথম ভালবাসার আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে একটি মুখ।

তিনুনি বলে উঠল, অসাধারণ! সে সঙ্গে সঙ্গে নার্সিসাসের এই জাগরণের মুহূর্তটিকে স্কেচে ধরে রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

এ ছবিখানা শেষ করতে লাগল পুরো তিনটে দিন। এই দিন-গুলোতে তিনুনির অনুরোধে অর্ক রইল অনুপস্থিত।

উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে নার্সিসাস অনন্য। একটি রোমান শিকারীর বেশে সজ্জিত তরুণ ঝুঁকে রয়েছে স্বচ্ছ জলের দিকে। তার অপূর্ব সুন্দর অবয়ব প্রতিবিম্বিত হচ্ছে জলে।

একটু দূরে হালকা কোমল রঙে আঁকা এক ছায়ামূর্তি। নতজানু হয়ে বসে তরুণীটি দুহাতের পাতায় ছুঁয়ে আছে একটি তরতাজা নার্সিসাস ফুল।

অরফিউস ছবিটিতে আলখাল্লা পরে দাঁড়িয়ে আছে এক বীণা-বাদক। তার দুখানি হাত প্রসারিত। একহাতে ধরা রয়েছে বীণা জাতীয় একটি যন্ত্র। তার চোখে মুখে সব হারানোর বিহ্বলতা। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে এক নারীর ছায়ামূর্তি। তার হাত দুটিও প্রসারিত। সে যেন বলছে, বিদায় প্রিয় বিদায়।

দ্য কুইন হ্যানট্রেস ছবিখানি আঁকা হয়েছে বনের পটভূমিতে। অর্ধনগ্ন দেবী ডায়ানার বিস্ম -বিস্ফারিত দৃষ্টি। তিনি যেন বলতে চান, কে এই মনুষ্যলোকের দুঃসাহসী শিকারী, যে আমার নিভৃত বিশ্রাম কুঞ্জে ঢুকে পড়েছে।

ডায়ানার একটু দূরে নতজানু হয়ে বসে আছে শিকারী অ্যাকটিয়ন। তার চোখে মুখে বিমূঢ় বিস্ময়! সারা অবয়বে অসহায়তার ছবি।

ছবির এককোণে হালকা এক রঙের একটি স্কেচ। ডায়ানার ক্রোধে অ্যাকটিয়ন পরিণত হয়েছে একটি শৃঙ্গওয়ালা হরিণে। সে পালাচ্ছে বনের গভীরে। তার নিজেরই শিকারী কুকুরগুলো তাদের প্রভুকে চিনতে না পেরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপর।

ছবির পর্ব শেষ হলো একদিন সবকটি ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল দুজনে।

অর্ক বলল, তোমার মত সদ্য জেগে ওঠা এক তরুণীর ভেতর যে এতখানি প্রতিভা লুকিয়েছিল তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

তিন্নির মুখে মৃদু হাসির আভাস। সে বলল, সংস্কৃতে একটি কথা আছে, সূর্য উদিত হলে পদ্ম প্রকাশিত হয়। তার অর্থ, সূর্যের ছোঁয়ায় পাপড়ি মেলে পদ্ম।

থামল তিন্নি। মুখে হাসিটি লেগে আছে।

অর্ক বলল, তুমি সূর্য আর পদ্মের উপমাটি কেন দিলে তিন্নি?

তোমার নামের অর্থই তো সূর্য। এর পরের অর্থটুকু বুঝতে আশা করি তোমার অসুবিধে হবে না।

ম্লান একটুকরো হাসির আভাস দেখা দিল অর্কের মুখে। সে বলল, তুমি তো আবার ছবি আঁকা শেখার জন্য আমেরিকাতে যেতে চাও না।

তিন্নি বলল, ও প্রসঙ্গ এখন থাক অর্ক। ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরেও ভাগ্য বলে একটা অদৃশ্য শক্তি আছে। তার ইচ্ছা না হলে বিফল হয়ে যাবে মানুষের সমস্ত চেষ্টা। আবার যার জন্য সামান্যতম চেষ্টাও করিনি, সেই অভাবিত তারই খেলায় এসে যাবে

হাতের মুঠোয়।

এ দেশের মানুষ বড় বেশী ভাগ্যবিশ্বাসী, তাই না তিনুনি?

বাবা বলতেন, নিজের পুরুষকারের ওপর ভর রেখে এগোতে হয়। শেষ ছোঁয়াটা তোমাকে ভাগ্যই দিয়ে দেবে। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, অভিযোগ জানিয়ে কিছু করা যাবে না। তার বিধান শেষ পর্যন্ত মেনে নিতেই হবে।

অর্ক বলল, এ আলোচনাটা এখন থাক। আমাদের ছবি নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল।

তিনুনি উদ্ভাসিত মুখে বলল, তোমার আশ্চর্য অভিনয় আমার ছবি আঁকার পেছনে বিরাট প্রেরণার কাজ করেছে।

তা আমি জানি না, তবে তোমার নির্দেশ অনুযায়ী আমি কাজ করে গেছি। এর আগে কোনদিনই অভিনয়ের সুযোগ আমার আসেনি। দেখো, তোমার ছবিগুলো খুব প্রশংসা পাবে।

তিনুনি বলল, আমরা দুজনেই এ ছবিগুলো সৃষ্টি করেছি। তাই আমাদের ভাল লাগাটাই এ ছবির শেষ কথা।

তিনুনি কথা শেষ করে উচ্ছ্বাসে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিল। সে হাত হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ উজাড় করে ধরে ফেলল অর্ক।

কতকক্ষণ দুজনে হাতে হাত বেঁধে বসে রইল। কেউ একটি কথা উচ্চারণ করল না। নীরবতাই বুঝি যোগাযোগের শ্রেষ্ঠ ভাষা।

আজকাল অপরাহ্ণের দিকে ভ্যালিতে ঐ নির্দিষ্ট টিলাটির ওপর উঠে বসে থাকে দুজনে। পড়ন্ত বেলায় মায়ামগ্ন হয়ে ওঠে চরাচর। ছোট্ট নদীর স্রোতের দিকে তাকালে মনে হয় গলিত সোনার প্রবাহ। বড় কোমল লাগে চোখে।

উত্তরে তাকালে দেখা যায়, তুষার চূড়ায় শেষ সূর্যের খেলা। এখানে কথার চেয়ে নীরবে উপভোগ করাই বড় পাওয়া।

এক ঝাঁক পাখি কলরব করতে করতে উড়ে গেল পশ্চিমের পাহাড়ী জঙ্গলটা লক্ষ্য করে। এখন নিচের উপত্যকায় শুরু হয়েছে গম তোলা। সেখানে ভোজের নিমন্ত্রণ শেষ করে ওরা

পরিতৃপ্তির আওয়াজ তুলতে তুলতে চলে গেল।

আপেল বাগিচা অথবা ফসল ক্ষেতের কাজ সেরে একদল মেয়ে ভ্যালি পেরিয়ে ঘরে ফিরছে। শেষ সূর্যের সোনায় স্নান করছে তারা। গোলাপী আভাযুক্ত আপেলের মত রঙের ওপর সোনালী প্রলেপ পড়ছে। নয়ন ভোলানো লাবণ্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে ওরা।

ওদের গলায় বসন্ত-উৎসবের গান। সারা দেশটা উৎসবকে কেন্দ্র করে আনন্দে মেতে উঠেছে। গৃহজাত হয়েছে সোনালী ফসল। আপেল বাগিচায় ফুলের স্তবক ঘিরে মত্ত মধুপের গুঞ্জন।

পাইন, সিডারের বনে, অথবা আপেল অর্চার্ডের ভেতর হঠাৎ হঠাৎ দেখা যাচ্ছে এক এক পাল ভেড়া। তাদের দলটাকে সিধে রাখছে, দু'একটা লোমশ কুকুর। হাঁটু অব্দি ঝোলা ফ্রক, পাকে পাকে ছাগল লোমের মোটা দড়ি দিয়ে জড়ানো কোমর, পায়ে চম্বার মোটা নাগরা, আর মাথায় কুলুর টুপি পরে ভেড়ু বকরির সঙ্গে চলেছে গাদ্দী পহাল। তাদের কোমর থেকে কুলহার (কুঠার) আর বজলু (থলে) ঝুলছে। তারা মুখে অদ্ভুত আওয়াজ তুলে, কখনো বা শিস্ দিতে দিতে ভেড়ু, বকরি তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

কয়েক দিনের ভেতরেই ওরা উঠতে থাকবে উঁচু পাহাড়ের ওপর। গ্রীষ্ম বর্ষা তুষার পাহাড়ের কোলে কোলে নিরু ঘাসের বুগিয়ালগুলিতে ভেড় চরিয়ে কাটাবে ওরা। আবার শরৎ এলে ওরা নেমে আসবে ভ্যালিতে। রুবানায় সুর তুলবে পথ চলতে চলতে।

নদী, কুহল, ছই, ঝর্ণা মেতে উঠবে আনন্দ গানে। ঝাঁক ঝাঁক ট্যুরিস্টের আনাগোনা শুরু হয়ে যাবে।

এখন বসন্তের গান গলায় নিয়ে কাজের শেষে ফিরছে তরুণীরা। তারা পাশ দিয়ে যাবার সময় ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে হাসির হুল্লোড় তুলছে।

তিন্নি আর অর্কও উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ওদের অভিনন্দন জানাল।

ওরা জ্যোৎস্না ধোয়া রাতে নাচ শুরু করবে। প্রেমিকের কোমর জড়িয়ে নাচবে নিদ্রাহারা রাতের নাচ।

এবার ফেরার পালা। টাট্টুতে চড়ে ফিরছে ওরা। ভ্যালি থেকে ওপরের বাঁধানো রাস্তায় উঠে এসেই মুখোমুখি হল আর এক অশ্বারোহীর।

তিনি হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, কিউপিডের মত সুদর্শন এই তরুণ যুবকটি কে তিনুনি ?

টাট্টুর থেকে তিনুনি তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। তার দেখাদেখি অর্কও। অশ্বারোহী অগত্যায় নেমে দাঁড়ালেন।

ইনি আমার আঙ্কেল, অর্ক।

অর্কদীপ নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল, আপনার কথা তিনুনির মুখে বহুবার শুনেছি।

তিনুনি আমার মমু, তাই সব মায়ের মত নিজের ছেলের কথা একটু বাড়িয়েই বলে।

তিনুনি কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, একদম না।

জুলিয়েন অর্কের দিকে ফিরে বললেন, তোমাকে এই প্রথম দেখলাম মানালীতে। এও জানলাম, তোমার নাম অর্ক। কিন্তু সংক্ষেপে পুরো পরিচয়টি যে চাই।

বদরীপ্রসাদজী আমার নানা। আমি অর্কদীপ চতুর্বেদী। আমেরিকা গভর্ণমেন্টের একটি সংস্থায় কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজে যুক্ত আছি।

দারুণ খবর। এই বয়সে এতখানি ওপরে উঠেছ ইয়ং ম্যান।

তিনুনি বলল, ও ভাল টেনিসও খেলতে পারে।

ও, রিয়েলি !

এখনও আমি শিখছি আঙ্কেল।

একদিন এসো আমার বাড়ি, আলাপ করব।

অর্ক বলল, আপনি যখন বলবেন তখনই আসব।

কাল অর্ককে নিয়ে চলে এসো তিনুনি, ব্রেকফাস্ট ওখানেই সারবে।

অবশ্যই যাব আঙ্কেল।

পরের দিন চায়ের টেবিলে অনেক কথাবার্তা হল। ক্যারলের বন্ধু গোষ্ঠীর জন্য ওরা কি ধরনের ব্যবস্থা করে রেখেছে তার একটা বিস্তৃত ফিরিস্তি দিল তিন্নি। শেষে বলল, আঙ্কেল, আপনার ব্যাঙ্কোয়েট হলখানা তিন দিনের জন্য আমাদের চাই।

অবশ্যই পাবে, কিন্তু ওখানে তোমরা কি প্রোগ্রাম করতে চাও বল?

আমরা আমাদের বন্ধুদের অনারে ওখানে একটা ছবির এগজিবিশান করতে চাই। তার সঙ্গে রোজই কিছু নাচগানও থাকবে। ইচ্ছে করলে আপনার হোটেলের গেস্টরাও যোগ দিতে পারেন।

অবশ্যই। তাছাড়া মানালীর সরকারী অফিসার এবং বিশিষ্ট-জনদের আমি আমন্ত্রণ জানাব। কিন্তু মমু, কার ছবির এগজিবিশান হবে? মায়ের?

একজন আনাড়ী শিল্পীর হাতের কাজ নিয়ে যদি এগজিবিশান হয় তাহলে কি আপনার আপত্তি আছে?

আরে আপত্তির কথাই বা উঠছে কেন? ঝিন্নির মেয়ে তিন্নির রুচি আর শিল্পবোধের ওপর আমার পুরোপুরি আস্থা আছে।

তিন্নি বলল, তবু আমি ভয় পাচ্ছি আঙ্কেল। আমাদের ছবিঘরে পেইন্টিংগুলো মজুদ আছে, আপনি নিজের চোখে একবার দেখে নিলে আশ্বস্ত হই।

জুলিয়েন বেনন বললেন, আজ সন্ধ্যায় যেতে পারি।

সারা দুপুর ধরে দুবন্ধুতে মিলে ছবিঘর গোছালো। ঘরের চারদিকের দেওয়ালে সাজিয়ে রাখল ছবিগুলো। বিদেশীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা সাম্প্রতিক ছবিগুলি রইল একদিকে। অন্যদিকে তিন্নিরই ভারতীয় পটভূমিতে আঁকা আগেকার ছবি-গুলো রাখা হল।

ঝিলমের কূলে সন্তান কোলে নিয়ে কাশ্মীর কন্যা, কুলুতে উন্মুক্ত প্রান্তরে তরুণ তরুণীর দশেরা নাচ, একটি পাঞ্জাবী দলের ভাঙড়া, পুরীর সমুদ্রজলে ভোরবেলা নুলিয়াদের নৌকো ভাসানো,—এমনি আরও অনেকগুলি পেইন্টিং।

জুলিয়েন মেজাজী এবং খামখেয়ালী, কিন্তু কথার মানুষ। তিনি সন্ধ্যায় এসে ঢুকলেন ছবিঘরে। তার আগে বাইরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন ঝুলন্ত ঝাড়লণ্ঠনটি। ঝকঝকে আলোর চারদিকে বর্ণালির ঝালর। একটি ইন্দ্রধনুর সাতরঙা স্নিগ্ধ বলয় সৃষ্টি হয়েছে।

প্রায় পাঁচ বছর পরে জুলিয়েন এলেন ছবিঘরে। শেষবার এসেছিলেন ডাক্তার মুখার্জীর সঙ্গে। ছোট্ট ফুলের বাগানটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন দু'বন্ধুতে। তখন দরজার সামনে এই রমণীয় ঝাড়লণ্ঠনটিকে ঝুলতে দেখা যায়নি।

জুলিয়েন ছবিঘরে ঢুকেই বললেন, সেই ইয়ংম্যানটি কোথায়? তাকে তো দেখছি না?

আপনি অর্কের কথা বলছেন?

হাঁ, সেই সুভদ্র ছেলেটি।

তিনি হেসে বলল, ও এখন তার নানা নানির সঙ্গে পুজোয় বসেছে।

কিসের পুজো?

আমি ঠিক জানি না আঙ্কেল। পারিবারিক কোন পুজো-টুজো হবে।

এবার জুলিয়েনের দৃষ্টি পড়ল ছবিঘরের দেয়ালগুলোর ওপর।

ওয়াণ্ডারফুল! শুধু ওয়াণ্ডারফুল নয়, এ দেখছি এক ওয়াণ্ডার ল্যান্ড।

জুলিয়েন বলে চললেন, ঐ তো বীণাবাদক অরফিউসের ছবি। প্রিয়তমা ইউরিডাইস অকালে চলে গেলেন মৃত্যুপুরীতে। অরফিউস তখন স্ত্রীর শোকে প্রায় উন্মাদ। তিনি অনেক কষ্টে মৃত্যুপুরীর সিংহদরজা পেরিয়ে এসে পেঁছিলেন স্বয়ং মৃত্যুর দেবতার সিংহাসনের সামনে। বিস্মিত দেবতাকে মুগ্ধ করলেন তাঁর বীণবাদনে।

আবেগে বিহ্বল দেবতা বললেন, মর্তবাসী মানব কি চাও তুমি আমার কাছে?

আমার প্রিয়তমা পত্নী অকালে এসেছে এই মৃত্যুপুরীতে, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

অসম্ভব হলেও তোমার এ প্রার্থনা আমি পূর্ণ করব, কিন্তু একটি শর্তে।

বলুন।

তোমাকে অনুসরণ করে চলবে তোমারস্ত্রী। তুমি কিন্তু মৃত্যু-পুরীর সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত পেছনে ফিরে তাকাবে না।

অরফিউস মৃত্যুর দেবতার শর্ত মেনে আসছিলেন, কিন্তু সহসা জেগে উঠল তাঁর মনের সংশয়,—ইউরিডাইস আমাকে অনুসরণ করছে তো?

তিনি প্রায় সীমানার কাছে এসেই পেছন ফিরে তাকালেন।

বিদায়, প্রিয়তম বিদায়!—বলতে বলতে দু'হাত অরফিউসের দিকে প্রসারিত করে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেলেন ইউরিডাইস।

পুরোটাই যেন অভিনয় করে বলে গেলেন জুলিয়েন বেনন।

শেষে বললেন, অসাধারণ কাহিনী। কিন্তু মম, এই ছবি-গুলির শিল্পী কে! আমি অবাক হচ্ছি তার হাতের কাজ দেখে। স্কেচে যেমন দক্ষতা, রঙের ব্যবহারেও তেমনি নিপুণতা। এই কি তোমার সেই শিল্পী?

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল তিনুনি।

কোথায় সে? তোমার হাসি দেখে মনে হচ্ছে, সেই আমেরিকা-বাসী ইয়ং ম্যানই এই ছবিগুলোর স্রষ্টা।

তিনুনি বলল, এই ছবি সৃষ্টির কাজে তার অনেকটাই দান আছে, কিন্তু সে নিজের হাতে এ ছবির একটি রেখাও টানেনি।

আমার কাছে তোমার কথাগুলো ধাঁধার মত লাগছে তিনুনি।

অর্ক কাহিনীগুলো পড়ে প্রধান পুরুষ-চরিত্রগুলোতে মূক অভিনয় করে গেছে। আর সেগুলো দেখে স্কেচ করে রঙ লাগিয়েছে…।

এইটুকু বলে থামল তিনুনি।

সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়েন বেনন প্রায় জড়িয়ে ধরলেন তাঁর আদরের মমকে।

তুমি এসব ছবি এঁকেছে মম্‌! আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না! তোমার মা নিশ্চয় দেখেছে। মেয়ের কৃতিত্বে অবশ্যই গর্বিত স্বনামধন্য শিল্পী মিসেস ঝিন্নি মুখার্জী।

না আঙ্কেল, মাকে একটা সারপ্রাইজ দেব বলে এখনও এ ছবি সম্বন্ধে কিছু বলিনি।

কিচেন থেকে হাঁক পাড়ল ভাগ্যতু, চা রেডি।

তিন্নি বলল, আসছি।

জুলিয়েন বললেন, এখানেও কি চায়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট রেখেছ নাকি?

আজই ভাগ্যতুদাদা এখানে প্রথম চায়ের পাট বসাল।

তিন্নি ভেতর থেকে ট্রেতে করে দু'কাপ চা আর এক প্লেট পকৌড়া নিয়ে এসে দেখে খেয়ালী জুলিয়েন আঙ্কেল ইতিমধ্যেই উধাও হয়ে গেছেন।

অনেকক্ষণ ঠায় বসে রইল তিন্নি। নিজের ছবিগুলোকে দেখতে লাগল নিবিষ্ট হয়ে। দেখতে দেখতে মনে হল, এ ছবি-গুলো কি তার নিজেরই আঁকা! বিশ্বাস করতেও যে ভরসা পায় না।

কে তার হাত ধরে আঁকালেন এতগুলো ছবি! কে সেই অদৃশ্য শিল্পী, যিনি তার চোখে সাতরঙের মায়াতুলি বুলিয়ে দিলেন।

অর্ক, তুমি নিঃস্বার্থভাবে তোমার বন্ধুর হৃদয়ে প্রেরণার দীপটি জ্বালিয়ে দিয়েছ। যদি সবার দৃষ্টিতে সার্থক হয় আমার ছবি তাহলে সে সাফল্যের পেছনে তোমার অদৃশ্য ভূমিকার কথা অমি ভুলতে পারব না কোন দিনও।

পেছনে পায়ের সাড়া পেয়ে ফিরে দাঁড়াল তিন্নি। জুলিয়েন আঙ্কেল মাকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার সামনে।

ঝিন্নিদেবীর চোখে মুখে বিস্ময়।

জুলিয়েন বললেন, দেখ সিস্টার, ভাল করে দেখ, এ তোমার হাতের তৈরী না তোমার ঐ শিক্ষানবিস মেয়ের।

ঝিন্নিদেবী ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন। তাঁর মুখে কথা নেই।

চোখের তারা দুটি ছবিতে নিবদ্ধ। একটি ছবি শেষ হলেই অন্যটিতে চলে যাচ্ছে চোখের দৃষ্টি। এ যেন পদ্ম বনে উড়ে বেড়াচ্ছে দুটি ভ্রমর।

অনেক সময় ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তিন্নির নতুন আঁকা ছবিগুলো।

দেখা শেষ হলে ফিরে দাঁড়ালেন। মা মেয়ে এখন মুখোমুখি। একে অন্যের দর্পণে দেখছে নিজেকে। সৌন্দর্যে, লাবণ্যে, গড়নে দুজনেই তুল্যমূল্য।

হঠাৎ ঝিন্নিদেবীর চোখ উপচে জল নামল। তিনি মেয়েকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলেন।

কতকক্ষণ পরে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে তিন্নি মা আর জুলিয়েন আঙ্কেলকে প্রণাম করল। তাঁরা চুম্বন করে ভালবাসা আর আশীর্বাদ জানালেন।

শেষে ঝিন্নিদেবী বললেন, অভাবনীয় কিছু কাজ তুমি করেছ তিন্নি। মনে রেখ এই ছবি আঁকতে আঁকতেই তোমার সিদ্ধি আসবে। তুমি যখন ছোট, তখন তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। আমি চেয়েছিলাম, তুমি বাবার মত ডাক্তার হবে। আর তোমার বাবা চেয়েছিল, মেয়ে মায়ের মত শিল্পী হবে।

আজ তারই ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে।

কিচেন ডোর থেকে উঁকি দিয়ে ভাগ্তু বলল, একবার চা নষ্ট হয়ে গেছে, ফিরে বানালাম। ঠাণ্ডা পকোড়াগুলো গরম করেছি, এখন চটপট খেয়ে নেবে কি?

তিন্নি কিচেনের দিকে এগিয়ে গিয়ে চা আর খাবার ভর্তি ট্রেখানা তুলে নিল।

ভাগ্তু চুপি চুপি বলল, একেবারে বেলুনের মত যে ফুলছিস রে।

তুই থাম হাঁদা।

পাঁচ

তেইশে এপ্রিল। বাতাসে তখনও বা গ্রীষ্মকালের ছোঁয়া লেগেছে। এদিক ওদিক ছড়ানো পাহাড়গুলোকে অনেক সময় অস্বচ্ছ মনে হয়। আসলে এ সময় এক ধরনের ধুলোর ঘূর্ণি ঘুরে ঘুরে ওপরের দিকে ওঠে। তাই পাহাড়ের গায়ের দৃশ্যাবলী অস্পষ্ট হয়ে চোখের আড়ালে চলে যায়। কিন্তু বাইরের গরম পাহাড় ঘেরা ভ্যালির ভেতর নামলে কিছু বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে একটা মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া সারা ভ্যালি জুড়ে খেলা করতে থাকে।

তেইশে এপ্রিল। তিনুনির ক্যালেন্ডারে একটি চিহ্নিত দিন। ঠিক নাস্তার সময় অর্ক তৈরী হয়ে এসে গেল। নাস্তা শেষ করে ওরা বেরিয়ে পড়বে কুলুর উদ্দেশ্যে।

ডাক্তার মুখার্জী মৃত্যুর কয়েক মাস আগে কিনেছিলেন একখানা সাদা মারুতি। তিনি সাধারণত টাট্টুতে চড়েই পাহাড়ী গাঁগুলোতে চিকিৎসা করে বেড়াতেন। ইদানিং মানালী থেকে কোথাও যেতে হলে বাসে করে যাতায়াতে তাঁর বেশ অসুবিধে হত। সময়েরও অনেকটা অপচয়। তাছাড়া নিজের ইচ্ছে মত বেরোনো যায় না, বাসের সময় ধরেই বেরোতে হয়।

এসব ভেবেই তিনি মারুতিখানা কিনেছিলেন। জুলিয়েন ওস্তাদ ড্রাইভার। তাঁর গাড়িতেই হাত পাকিয়েছিলেন ডাক্তার মুখার্জী। মারুতি আসায় স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে প্রায়ই তিনি চলে যেতেন কুলু আর নাগগরে। কখনো সখনো দু'একদিন কাটিয়েও ফিরতেন।

তিনুনি অনেক সময় বাবা মার সঙ্গে যেত না। সে হয়তো মানালীতে নানা কাজে মেতে থাকত। ঝিন্নিদেবীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন ডাক্তার মুখার্জী। সে সময় প্রথম যৌবনের দিনগুলো ফিরে আসত তাঁদের জীবনে। তাঁরা অতীতের মত হাত ধরাধরি করে ঘুরতেন কুলুর আপেল বাগিচায়। কাঠবেড়ালির দুষ্টুমি

দেখে হাততালি দিতেন। চিঁড়পাখিদের ল্যটোপ্যটি দেখে ফেটে পড়তেন উল্লাসে।

সন্ধ্যা ঘনালে ঝিন্নিদেবী জিজ্ঞেস করতেন, আউট হাউসে থাকার ব্যবস্থা করি।

ডাক্তার ম্যখাজী বলতেন, কেন, প্যরানো কাঠের বাড়িতে থাকতে তোমার অস্যবিধে আছে?

ঝিন্নিদেবী মনে মনে তাই চাইলেও ম্যখ ফ্যটে কিছ্য বলতে পারতেন না। তিনিও তাঁর অতীত দিনগ্যলোকে গভীরভাবে পেতে চাইতেন।

তিনি উত্তর করতেন, আউট হাউসটাকে নত্যন করে গড়ে ত্যলেছ, তাই বলছিলাম। প্যরানো কাঠের বাড়ি কাঠের সিঁড়িতে তোমার হয়ত অস্যবিধে হবে।

কিছ্যমাত্র না। ঐ কাঠের সিঁড়ির ওপরের ঘরটিতে শ্যয়ে আমি প্রথম দিনের মত কান পেতে অপেক্ষা করব সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ শোনার জন্য। তোমার কানের সেই ছোট্ট দ্যলগ্যলো ম্যখ ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে ট্যলট্যল করে দ্যলে উঠবে, সে দৃশ্য দেখার লোভ আমি আজও ছাড়তে পারিনি ঝিন্নি।

মৃত্যুর ছ'মাস আগে ডিসেম্বরে কোলি-রি-দেয়ালির মেলা দেখতে টাট্টুতে চড়ে বরফের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন নাগ্গরে। ঝিন্নিদেবী আগে থেকে গিয়ে ওপরে ফরেস্ট বাংলোর একখানা র্যম ব্যক করেছিলেন।

বিয়ের আগে প্রেমপর্বের মত তাঁরা সেদিনও সন্ধ্যার ম্যখে মেলা দেখে ফিরে এসেছিলেন নির্জন বাংলোতে। হাউই উঠেছিল কেল্লা থেকে। এখন যেটি সরকারী বাংলো। সেই প্রথম মেলা দেখার দিনটির মত ও'রা দ্যজনে একই কম্বলের উত্তাপে থেকে জানালার ফাঁকে দেখেছিলেন উজ্জ্বল হাউইয়ের আকাশপথে ওঠা নামা। আকাশ থেকে অজস্র তারাফ্যলের ঝরে ঝরে পড়া।

জীবনের উত্তাপ অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এলেও তাঁরা নাগ্গরের উৎসবে প্রায় প্রথম দিনের মতই রোমাঞ্চ অন্যভব করেছিলেন। স্মৃতির স্যরভি সম্ভবত সহজে ম্যছে যায় না।

নাস্তা শেষ হলে তিন্নি বলল, মা, আমি যদি বাবার গাড়িখানা চালিয়ে নিয়ে যাই তাহলে তোমার আপত্তি আছে ?

ঝিম্নিদেবী বললেন, তোমার বাবাই তো হাতে ধরে তোমাকে গাড়ি চালানো শিখিয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই বাবার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে। সাবধানতার কথা আমি কিছু বলব না। ওটা যে যার নিজের হুঁশিয়ারীর ব্যাপার। তুমি নিশ্চিন্তে যাও।

তিন্নি বলল, অর্ক কিন্তু ওস্তাদ ড্রাইভার মা।

দুজনে আনন্দে চলে যাও। আশা করি রাত আটটার ভেতর ফিরে আসবে।

তুমি চিন্তা কর না মা, আমরা ঠিক সময়েই ফিরব।

অর্ক আর তিন্নির মারুতি উঁচু নিচু রাস্তায় ঢেউ তুলে বেরিয়ে গেল।

সারা মানালীর মানুষের কাছে তিন্নি কেবল পরিচিত নয়, একান্ত প্রিয়, ঘরের মেয়েটির মত।

ডাক্তার মুখার্জীর মেয়ে হিসেবে তিন্নির ওপর শহর আর পাহাড়ী বস্তি এলাকার মানুষদের বাড়তি একটা আকর্ষণ থাকলেও তার ব্যক্তিগত চরিত্রের নম্রতা, সকলের প্রতি তার সুমিষ্ট ব্যবহার ও পরোপকারের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাকে সবার একান্ত প্রিয় ও আপনজন করে তুলেছিল।

শহর পেরিয়ে যাবার সময় অনেকেই হাত নাড়ল। গাড়ি চালাতে চালাতেই তিন্নি তার হাত নেড়ে নেড়ে ওদের প্রত্যভিবাদন জানিয়ে গেল।

এখানকার মানুষ তোমাকে খুব ভালবাসে তিন্নি।

তিন্নি মজা করে বলল, কেন, আমেরিকার মানুষ আমাকে ভালবাসে না ?

অর্ক বলল, চুম্বক পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই থাক, লোহা তার দিকে ছুটে যাবেই। তোমার ভেতর সেই আকর্ষণী শক্তি আছে তিন্নি।

গাড়িতে ব্রেক কষে তিন্নি অর্কের হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলল, তুমি আমার সব সেরা

বন্ধু অর্ক। একদিন কথা প্রসঙ্গে বাবা বলেছিলেন, জুলিয়েনের কাছে হৃদয় উজাড় করে আমি যে কথা বলতে পারি, তোমার মা আমার সব থেকে আপনজন হলেও তার কাছে সব সময় তা পারি না।

আবার গাড়ি চলল। কুলুতে পেঁাছে নিজেদের আউট হাউসে উঠল ওরা। ঢোল ময়দানের পেছনের দিকের পাহাড়ে আপেল বাগিচার এক প্রান্তে আউট হাউস। মূল বাড়িখানা পুরানো দিনের। কাঠ আর শেলট পাথর দিয়ে তৈরী। আউট হাউসটি পরে মজবুত করে গড়া হয়েছে। একেবারে আধুনিক সব ব্যবস্থা।

কেয়ারটেকার গোপীনাথজী ঘর খুলে দিলেন। ছোট মালিক আর তার সঙ্গে এক বন্ধু এসেছেন। তাই কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না তিনি। সদা তটস্থ হয়ে আছেন।

তিনুনি বলল, চাচাজী, বাড়িখানা বেশ ছিমছাম করে রেখেছেন। মা শুনলে ভারি খুশী হবেন।

মানালী থেকে কোন চিঠ্‌টি আসেনি মালিকের।

তাতে কি হয়েছে। আপনার ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে ভারি আরাম বোধ করছি।

এ তো আপনার মোকাম আছে ছোট মালিক।

তিনুনি হেসে বলল, এ মোকাম কার সে ফয়সালা পরে হলেও চলবে, এখন একটুখানি গরম পানির ব্যবস্থা হলে স্নানটা সেরেনি।

কেন ছোট মালিক, স্নানঘরে তো গিজার রয়েছে। এখুনি কুন্তিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, গরম পানিতে বালতি ভরে দেবে।

তিনুনি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, না না সে সব কিছু করতে হবে না। আমি ঠিক জানতাম না যে ওখানে গিজার রয়েছে।

ওপরের স্নান ঘরেও রয়েছে ছোট মালিক। দুটো বাথরুমেই নতুন সাবন আর তোয়ালে রয়েছে।

চাচাজী আমরা এ বেলা দুজনে লাঞ্চ করব। বিকেল পাঁচটা নাগাদ চার পাঁচজন বন্ধু এসে পড়বে। তাদের জন্য একটুখানি হাই-টির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ভেজ না ননভেজ ছোট মালিক?

ননভেজ।

কথা শেষ হতে না হতেই এসে গেল কুন্তি।

ট্রেতে এনেছে দু'কাপ চা, কিছু সলটেড কাজু আর দুটো মেঠাই।

বছর তের বয়সের মেয়েটি। ভারি মিষ্টি দেখতে। কানে দুটি ছোট্ট ঝুমকো দুল। গলায় পুঁতি আর লাল ফলের বীজের মালা। বিনুনি করেছে জরির ফিতে দিয়ে। লাল ট্যাসেল ঝুলছে।

ট্রেটি টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে কুন্তি বলল, মেমসাব লাঞ্চে কি খানা পাকাব?

তিন্নি তার হাত ধরে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, আমি মেমসাব নই কুন্তি, আমি তোমার বড় বহিন, তিন্নি দিদি।

কুন্তি উচ্চারণ করল, তিন্নি দিদি।

তার ছোট্ট মিষ্টি মুখখানা খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

বেলা তিনটে নাগাদ আউট হাউস থেকে বেরিয়ে পড়ল তিন্নি আর অর্ক। তারা কুলু-মানালী হাইওয়ের ওপর ক্যারল আর তার বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করবে। ঐ পথ দিয়েই যেতে হবে ক্যারলদের। জুলিয়েন আঙ্কেল বলেছিলেন, ওঁর অ্যামব্যাসেডার-খানা চণ্ডিগড়ে ক্যারলের কাছেই রয়েছে। ওটা নিয়েই ও আসবে।

অর্ক আর তিন্নি রাস্তার ধারে পায়চারি করতে লেগে গেল।

এ সব অঞ্চল তিন্নির নখদর্পণে। অর্কের কাছে একেবারে অচেনা, তাই সবই শোভাময়। সে কুলুর নিসর্গ দৃশ্য দুচোখ ভরে দেখতে লাগল।

এখন আপেলের ডালে ডালে ফুলের বদলে ফল দেখা দিয়েছে। বড় বড় ডুমুরের আকারে ফলগুলো ডাল ছেয়ে ফেলেছে।

ওদিকে এপ্রিলে বরফ গলতে শুরু করায় হাজারো রঙবাহারি ফুল উঁকি দিচ্ছে পাহাড়ে জঙ্গলে। পথের ধারে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে, ছই বা স্রোতধারার তীরে তীরে উঁকি দিচ্ছে, দুলছে, কত

জাতি, কত বর্ণের ফুল। রোডোডেনড্রনেও লাল ফুল শাখায় শাখায় আগুনের শিখা তুলে ধরেছে।

অর্ক উত্তেজিত গলায় বলল, ঐ তো দূরে দেখা যাচ্ছে অলিভ-গ্রীন রঙের একখানা অ্যামব্যাসেডার।

তিনুনি হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

আরে না না, ক্যারলের অ্যামব্যাসেডারের রঙ অফ্ হোয়াইট।

অর্কও তিনুনির হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, আমি কি অতশত রঙের খবর রেখেছি নাকি। এবার অফ্ হোয়াইট দেখলেই ধরব।

আবার হাসি, ইতিমধ্যে ক্যারল যদি গাড়ির রঙটা বদলে ফেলে?

তাইতো আমি রঙের বাদবিচার না করে অ্যামব্যাসেডারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি।

তিনুনি বলল, তাই হোক্, তুমি অফ্ হোয়াইট বাদে সব রঙের গাড়ি লক্ষ্য কর, আমি শুধু অফ্ হোয়াইট দেখে যাই।

দুজনের জল্পনা কল্পনার ভেতরেই একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল ওদের গা ঘেঁষে। লাল রঙের মারুতি ভ্যান।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ক্যারল। ধীরে ধীরে অন্য সবাই।

পরিচয় পর্ব দ্রুত সারা হল হাত নাড়া আর হাই হাই আওয়াজ তোলার ভেতর দিয়ে।

ওরা সবাই মিলে এলো তিনুনিদের আউট হাউসে। আগন্তুকদের ভেতর তিনজন ছেলে আর একটি মাত্র মেয়ে।

তিনুনি মেয়েটির হাত ধরে নিয়ে গেল ওপরের ঘরে। বাকিরা নিচেই হাত মুখ ধুয়ে পোশাক ছেড়ে সারাদিনের গ্লানিমুক্ত হতে লাগল।

ফিটফাট হয়ে ওরা এলো খাবার টেবিলে। স্যালাড, মাংসের কাটলেট আর এক প্লেট করে ঘুগনি। সঙ্গে সফ্ট ড্রিংক্স্।

পরে চা আর কিছু স্ন্যাক্স্ এলো।

হেভি টির পরে বাগান থেকে সদ্য তোলা কিছু গোলাপ তিনুনির গোপন নির্দেশে কুন্তি এনে সবার হাতে একটি একটি

করে ধরিয়ে দিল।

খুশীর ঢেউ উঠল। সবাই আদর করল কুন্তিকে। অনেকগুলো টফি উপহার পেল সে।

এবার মানালীর পথে আগে পিছে দুটো গাড়িই চলবে।

ওদের ভেতর কপিল সাহানি বেশ জমাটি ছেলে। ধ্রুব পোড়েল কম কথা বলে কিন্তু আসরে বসে ঠিক জায়গায় হেসে উঠতে পারে। রত্নাবলী কুট্টি কেরলবাসিনী এবং মধুরহাসিনী। হরিহরন কুট্টি চণ্ডিগড়ের খ্যাতিমান নিউরোসার্জেন। তাঁর একমাত্র কন্যা রত্নাবলী। মেডিক্যাল স্টুডেন্ট। মোহিনী আট্টমে কেরল সরকারের পুরস্কারপ্রাপ্তা।

ধ্রুব আর কপিল ছুটি পড়লেই ট্রেকিংয়ের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। পিণ্ডারী গ্ল্যাসিয়ার, অমরনাথ, মণিমহেশ, এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ওরা ঘুরে এসেছে। এবার গাড়িতে যাবে রোটাং হয়ে লে। ফিরবে ট্রেকিং করে মানালী। তারপর সবাই মিলে ফিরবে চণ্ডিগড়।

কপিল এগিয়ে এসে অর্কের কোমর বেষ্টন করে বলল, বন্ধু তোমার সঙ্গে আমাদের নতুন পরিচয়, তুমি কি এ পথটুকু আমাদের সঙ্গ দেবে ?

নিশ্চয়ই, তবে একটি শর্তে।

বল।

আমি আনাড়ী হাতে বাকি পথটুকু তোমাদের ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে।

কপিল বলল, আমরা সবাই ক্লান্ত, তোমার হাতেই নিজেদের সঁপে দিতে চাই।

সবাই হেসে উঠল। অর্ক স্টিয়ারিং ধরল। কপিল সাদা মারুতিখানার দিকে ক্যারলকে ঠেলে দিয়ে বলল, এ গাড়িতে আর ভিড় বাড়িও না গুরু।

ততক্ষণে সাদা মারুতির স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে তিনানি। ক্যারল তার পাশে গিয়ে বসল। লাল মারুতি বেরিয়ে গেল আগে। অর্কের পাশে বসে রত্নাবলী। সে তিনানির উদ্দেশ্যে

হাত নাড়ল। তিনুনিও মাথাটা বের করে একমুখ হাসি উপহার দিল।

লাল মারুতির পেছনে চলেছে সাদা। তিনুনি নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি সামনের দিকে। পাশে বসে তাকে লক্ষ্য করছে ক্যারল।

আজ দেখা হবার পর থেকে তিনুনি তার সঙ্গে মুখ তুলে একটিও কথা বলেনি। অতিথি আপ্যায়নে তার আন্তরিক উত্তাপের ঘাটতি ছিল না। পরিবেশনের সময় স্বাভাবিকভাবে সে সবাইকে খাবার এগিয়ে দিয়েছে। হাসি গল্পে যোগ দিয়েছে সবার সঙ্গে। কেউ বুঝতেই পারেনি তিনুনির মনের গভীরে কোন দুঃখ বাসা বেঁধেছে কিনা।

ক্যারলই প্রথম কথা বলল, আমার ওপর এত অভিমান তোমার?

এ কথা কেন?

দেখা হবার পর থেকে একটিও কথা বলিনি। এক মাস পাঁচ দিন পার হয়ে গেল, তোমার কোন খবর নেই।

তিনুনি বলল, আমার একটা ভুল ধারণা ছিল, ক্যারল বেননের এমন কোন খবর নেই যা আমার অজানা। কিন্তু সে ভুলটা তুমি ভেঙে দিয়েছ।

বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাইছ। আমি তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম তিনুনি। ড্যাডি যে আমার পাঠানো খবরটুকু হজম করতে পারবে না, তা আমি বুঝতে পারিনি।

তুমি কি মনে কর তোমার চেয়ে আঙ্কেল আমাকে কম ভালবাসেন? তিনি খবরটা পেয়ে আমার কাছে গোপন রাখবেন, এই কি তোমার ধারণা হল? চিঠি পেয়েই আমাকে ডেকে বললেন, মমু, ক্যারল তার বন্ধুদের নিয়ে আসছে টুয়েন্টি থার্ড এপ্রিল। ওরা সকলেই তোমার গেস্ট হয়ে থাকবে কয়েক দিন। সব ব্যবস্থার ভার তোমার।

এবার অন্য প্রসঙ্গে এল ক্যারল, অর্ক ছেলেটির সঙ্গে ভাল করে আলাপ হল না।

তিনুনি বলল, সুযোগ চলে যায়নি।

তোমার সঙ্গে আলাপ হল কি করে?

যেমন করে একটি মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলের আলাপ হয়। কেন ঈর্ষা হচ্ছে নাকি?

ক্যারলের মুখে হাসি, তা একটু হচ্ছে বইকি।

আমার তো কই হচ্ছে না।

তোমার কেন হবে?

বাঃ, বার ঘণ্টা সুন্দরী মধুরহাসিনীকে যে পাশে বসিয়ে আনলে।

এবার হো হো করে হেসে উঠে ক্যারল জড়িয়ে ধরতে গেল তিনুনিকে।

গাড়ি দু'একবার বাঁক নিল। শেষে জোর ব্রেক খেয়ে থেমে গেল।

এখুনি অ্যাকসিডেণ্ট হত যে।

ক্যারল জড়িয়ে ধরে বলল, দুজনের মিলনটা গভীর হত।

ক্যারলের কাঁধে মাথা রেখে সুখের দু ফোঁটা অশ্রু ঝরালো তিনুনি।

ক্যারল বলল, এবার আমি চালাই।

না, আড়াইশো কিলোমিটারেরও বেশী তুমি চালিয়ে এসেছ, এখন সীটে গা ঢেলে দিয়ে রিল্যাকস্ কর।

আমি একা চালাইনি। কপিল, রত্নাবলীও বেশ কিছু পথ চালিয়ে এনেছে।

রত্নাবলী মেয়েটি কিন্তু বেশ। সারাক্ষণ মুখে হাসিটুকু লেগে আছে।

কপিলও দারুণ আমুদে, ধ্রুব একটু চাপা।

তোমার বেস্ট্ ফ্রেণ্ড কপিল।

কি করে বুঝলে?

ওই তো অর্ককে ও গাড়িতে টেনে নিয়ে তোমাকে আমার দিকে ঠেলে দিলে।

দারুণ ধরেছ। এই এক বছরে তোমার বুদ্ধি দেখছি বেশ

ঝকঝকে হয়েছে।

তিন্নি একটা বাঁক ঘুরতে ঘুরতে বলল, পড়াশোনা কেমন চলছে?

পরীক্ষকরা আমার পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হলেও আমি নিজে নই।

কেন?

বেশীক্ষণ পড়তে পারছি না। রাত নটাতেই বিছানায় ঢুকছি। অন্য বন্ধুরা বারোটার আগে কেউ বিছানায় যায় না।

ওরা এতক্ষণ কি করে?

বেশীর ভাগ পড়াশোনা করে। বাকিরা টিভি খুলে গভীর রাতের সিনেমা দেখে।

তুমি এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় কেন?

একটি মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখব বলে।

গাড়ির ভারতীয় চালিকাটি ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে একমাত্র ইংরেজ আরোহীকে একটি ঘুষি মারল।

সে ঘুষি পরমানন্দে হজম করল ইংরাজ যুবা পুরুষটি।

তিন দিনের ভেতর ধ্রুব আর কপিল টেন্ট এবং পোর্টার যোগাড় করে ফেলেছে। ওরা আর একটি দিন মাত্র থাকবে মানালীতে। তারপর ওদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী শুরু হবে যাত্রা।

তাই আজ রাতেই সপ্তরথীর (ভাগতুরামও অন্যতম এক রথী) অনারে ডিনার পার্টির আয়োজন করেছেন জুলিয়েন বেনন।

ব্যাঙ্কোয়েট হলে তিন্নির চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন জেলাশাসক মহোদয়। তারপর দেড় ঘণ্টার ঠাসা প্রোগ্রাম। সবশেষে নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের ডিনারে আপ্যায়ন।

তিনদিনে ওরা সাতজন মিলে দেড় ঘণ্টার ভ্যারাইটি প্রোগ্রামের জন্য রিহার্সেলের পর রিহার্সেল দিয়ে গেছে। ডাক্তার মুখার্জীর গেস্ট হাউসের প্রশস্ত লনে একক, দ্বৈত আর সমবেত নাচের রিহার্সেল হয়েছে। গানগুলিও শিল্পীরা প্র্যাকটিস করে নিয়েছে যে যার যন্ত্র সহযোগে।

ছবিঘরে সাতরঙা আলোর তলায় দাঁড়িয়ে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হাসি ছড়িয়েছে। ফটোগ্রাফার মুভি ক্যামেরায় তুলে নিয়েছে সে সব আনন্দঘন মুহূর্তগুলো। তিন্নি তার আঁকা কার্ডগুলো বন্ধুদের উপহার দিয়েছে ঐ ছবিঘরের চা-চক্রে।

সর্বত্র খুশীর জোয়ার। তিনদিন অতিথিরা চষে বেড়িয়েছে মানালী। কখনো পাহাড়চূড়ায়, কখনো ভ্যালির তলায়। আবার কখনো বা ঘন সবুজ পাইন বনের নিচে আলোছায়ার ফুলতোলা ঘাসের জাজিমে।

প্রথমে ছবির উদ্বোধন হল। তিন্নি প্রতিটি ছবির বিষয়বস্তুর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে দিল দর্শকের সামনে।

ছবি দেখার শেষে শুরু হল দর্শকের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন।

জেলাশাসক ছবির একজন রসিক সমঝদার। তিনি বললেন, এত অল্প বয়সে হাতের এমন বলিষ্ঠ টান অভাবনীয়। স্কেচের গুণে প্রতিটি ছবি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ছবির ভাবগুলো ক্যানভাসের বিশেষ একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত না করে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ক্যানভাসের বিভিন্ন জায়গায়। তাতে ভাবটি বিস্তীর্ণ পটভূমিতে বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু মূল ভাবটি কি এবং ছবির কোন অংশে তা পরিস্ফুট, আঁকার গুণে দর্শকের বুঝে নিতে একটুও অসুবিধে হয় না। শিল্পীর জন্য রইল আমার অজস্র অভিনন্দন।

দর্শকের ভেতর থেকে উঠল করতালি ধ্বনি। জুলিয়েন বেনন আজকের বিশিষ্ট অতিথির হাত দিয়ে ঝকঝকে রুপোর কাজ করা ফ্লাওয়ার ভাসে শিল্পীকে একগুচ্ছ গোলাপ উপহার দিলেন।

মঞ্চের স্ক্রীন উঠলে দেখা গেল ভাগ্তুরাম পুরোপুরি গাদ্দী পহালদের পোশাক পরে মঞ্চের মাঝখানে বসে আছে। মাথায় পহালদের টুপি। তার দুটো হাতে ধরা আছে বাঁশুরি। ঠোঁট দুটি ফুঁ দেবার জন্য প্রস্তুত।

উইংসের ভেতর থেকে প্রথমে ভেসে এল দুছত্র কথা : মাসের পর মাস ঘর সংসার ছেড়ে গাদ্দী পহালরা তাদের ভেড়ার পাল নিয়ে বেরিয়ে যায় নতুন নতুন চারণভূমির সন্ধানে। ঘরের ভেতর

বিরহিনী বধূরা চোখের জল ফেলে বলে, হে আমার প্রিয়, তোমার আমার মাঝে আজ দুস্তর ব্যবধান। মনে হচ্ছে আমার বুকের মাঝে কেউ যেন গেঁথে দিয়েছে তীক্ষ্ণধার এক তলোয়ার।

কথা শেষ হলে নেপথ্যে শুরু হল নারীকণ্ঠের গান, তার সঙ্গে বাঁশুরির সুর লহরী। ভাগতুরাম বাঁশিতে সুর তুলেছে, নেপথ্যে গাইছে তিনি।

'আসা ওয়ারে ওয়ারে
তোঁসা পারে পারে
তোঁর চলান্দি চাল বিছানি,
সজ্জন মিলন লাগে।
গুটকে যাফিয়াঁ পাইয়াঁ,
খিণ্ডদে খিণ্ডদে সজ্জন
খিণ্ডন লাগে,
জিয়াঁ তলোয়ারি দে
ফাট্ সেইয়োঁ।'

গান থামলে ভাগতুরাম নতুন করে সুরের ঢেউ তুলল। সমস্ত গানের সুরটা সেধে নিল বাঁশিতে।

এবার শুরু হল কথা ঃ

নদীর ধারে থেকেও তিতির পাখি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে। বল, প্রিয়তমের কাছ থেকে যে নারী দূরে রয়েছে তার বুকের হাহাকার কতখানি।

আবার গান শুরু, কান্নাভরা গলার গান ঃ

নদীরে কট্লা মন্রো তত্রু চীষে
জীনা রে রুষো সজনো
তীনে গি জীব্না বোলো কিসে।

গান শেষ হল, কিন্তু বাঁশি ধরে রইল তার সুরের রেশ।

এখন সামান্য কদিনের জন্য ঘরে ফিরে এসেছে পহালরা। হোক্ সামান্য কটি দিন তবু খুলে গেছে আনন্দের ফোয়ারা। বাঁশিতে তাই ঢেউ তুলেছে মন মাতানো সুর।

সহসা বাঁশিওয়ালাকে ঘিরে শুরু হল উত্তাল খুশীর নাচ।

দুটি ছেলের মাঝে একটি করে মেয়ে। মণ্ডলি রচনা করে নাচছে। ধীরে ধীরে মাতন উঠল নাচে। বাঁশুরির সুর তুফানের মত আকাশ ছুঁয়ে বাজছে। আনন্দে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মঞ্চ। ঘন ঘন করতালির মধ্যে নেমে এল ড্রপসীন।

পর্দা উঠলে দেখা গেল ধবধবে সাদা পোশাক পরে জরির টুপি মাথায় দিয়ে ভায়োলিনে সুর তুলেছে ক্যারল। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন যুবক। প্রসিদ্ধ বেনন পরিবারের ছেলে। প্রিন্সের মহিমায় দাঁড়িয়ে বেহালায় সুর তুলছে।

সেই সুরের টানে নাচের ভঙ্গীতে মঞ্চে এসে ঢুকল একটি পুরুষ ও একটি নারী।

পুরুষের পরনে টাইট নেভি ব্লু পোশাক। মাথায় সাদা টুপি। টুপির সামনে একটি লাল পালক গোঁজা। মেয়েটির পরনে দাক্ষিণী পোশাক। সুন্দর খোঁপা করে চুল বাঁধা। অনেকটা মোহিনী আট্টমের সাজে সজ্জিত।

ওরা মূক অভিনয় করে চলল কিছুক্ষণ।

বোঝা গেল, পুরুষটি সৈনিক। সে ছুটি কাটাতে এসেছিল ঘরে। কদিন আনন্দে কাটল। এবার কাজের জগতে ফিরে যেতে হবে পুরুষটিকে। মেয়েটি তাকে যেতে দিতে চায় না।

পুরুষটি আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইছে, সে সৈনিক। তার আছে দেশরক্ষার দায়িত্ব। বীরের মত লড়াই করতে হয় তাকে।

ভায়োলিনে গম্ভীর নাদে দ্রুত গৎ বাজতে লাগল। মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝনা।

নাচছে অর্ক। সৈনিকের বিক্রম নিয়ে সে বিদ্যুৎগতিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সারা মঞ্চ।

পাশ্চাত্য নৃত্যের গতিশীলতা অর্ককে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সে মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাক খাচ্ছে তীব্র বেগে। একটা ঘূর্ণি যেন ঘুরে চলেছে প্রবল শক্তিতে। তার সঙ্গে সঙ্গে দমকে দমকে ঝড়ের ঢেউ উঠছে ভায়োলিনে।

হঠাৎ নাচের তাণ্ডব থেমে গেল। পুরুষ স্থির হয়ে তাকিয়ে

আছে নারীর দিকে।

নারীর শেষ অস্ত্র প্রয়োগের জন্য তৈরী হয়েছে রত্নাবলী। সে এখন মোহিনী আট্টম নৃত্যের মোহিনী।

ভায়োলিনের মধুর সুরে নাচছে মোহিনী। ওষ্ঠে হাসি, দৃষ্টিতে সম্মোহনী যাদু। সারা অঙ্গে আমন্ত্রণের তরঙ্গ তুলে রত্নাবলী নাচছে। দক্ষিণভারতের শিক্ষিতা নর্তকীর পায়ের নূপুর যেন কথা বলছে। মোহিনীর দৃষ্টিতে আকর্ষণ, দেহে আমন্ত্রণ আর চরণের ঝঙ্কৃত নূপুর যেন তালে তালে বলছে, যেও না, যেও না, যেও না, প্রিয় যেও না।

রত্নাবলীর অপূর্ব নাচে মুগ্ধ দর্শককুল। একটু আগে অর্কের পাশ্চাত্য ভঙ্গিমায় নৃত্য পরিবেশনের সময় বিস্মিত হয়েছিল দর্শকেরা, এখন একেবারে বিমুগ্ধ।

তবু চলে যেতে হয়। সংসারের সমস্ত আকর্ষণের পাশ ছিন্ন করে দেশমাতৃকার আহ্বানে চলে যেতে হয় সৈনিককে।

যাবার আগে প্রিয়তমার জন্য রেখে যায় শেষ চুম্বন।

কোনারকের সূর্যমন্দিরে মুদিত আঁখি প্রেমিকার দেহ বামহস্তে বেষ্টন করে পুরুষ যেমন দক্ষিণ করে তার মুখমণ্ডল তুলে ধরেছে চুম্বনের আশায়, ঠিক তেমনি রত্নাবলীর মুখখানি তুলে ধরল অর্ক গভীর আবেগে।

এরই ভেতর ভায়োলিনে বেজে উঠল বিদায়ের সুর। মুগ্ধ প্রেয়সীকে ছেড়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিল বেদনা-বিক্ষত পুরুষ।

যবনিকা নেমে এল দীর্ঘস্থায়ী করতালিধ্বনির ভেতর দিয়ে।

ছোট্ট অনুষ্ঠানের ভেতর প্রাণের যে ছোঁয়া আছে তা সমস্ত দর্শক-হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল।

অনুষ্ঠানের শেষে আবার মঞ্চে উঠলেন জেলাশাসক। তিনি নৃত্য, বাদ্য আর গীতের অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন।

এবার ঝিন্নিদেবী প্রদত্ত সাতখানি কুলুর শাল শিল্পীদের উপহার হিসাবে দেওয়া হল।

ধ্রুব আর কপিল রোটাং গিরিপথ পেরিয়ে কেলংয়ের দিকে

যাত্রা করার পর ওরা মানালীর আশপাশের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো একটি একটি করে দেখে নিল। রোটাংয়ে গিয়ে দেখে এল কান্তিময়ী বিপাশার উৎসমুখ।

এসব অর্ক আর রত্নাবলীর কাছে প্রথম দেখার রোমাঞ্চ বয়ে আনলেও ক্যারল আর তিন্নির ভেতর সে রোমাঞ্চ জাগাতে পারল না। তবু স্থানগুলোর এমন মাহাত্ম্য যে বহু-দেখা হলেও তা পুরানো হয় না।

এবার চারমূর্তি এল শহরে। কুলুর বাংলোতে আগেভাগেই এসে হাজির ছিল ভাগতুরাম। ঝিন্নিদেবী তাকে ঐ চারজনের দেখভালের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানেন, ভাগতুর নয়নের মণি তিন্নি। তাই তাকে পাঠিয়ে ঝিন্নিদেবী নিশ্চিন্ত ছিলেন সবদিক থেকে।

ওরা ভোরে নাস্তা সেরে পায়ে হেঁটে ঘুরে এল রঘুনাথজীর মন্দির। কুলুর শত শত দেবতার ভেতর রঘুনাথজীই প্রধান দেবতা।

এর পরের দিনই ওরা খুব ভোরবেলা বেরিয়ে গেল বিজলী মহাদেব মন্দির দেখতে। গাড়িতে না গিয়ে পায়ে হেঁটেই গেল ওরা। কুন্তী আর ভাগতুরাম মিলে অনেক খাবার তৈরী করে ব্যাগে ভরে দিল ওদের। দশ কিঃ মিঃ রাস্তা পাড়ি দিতে হবে, আবার মন্দির দর্শন করে ফিরে আসতে হবে এতখানি পথ পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যার আগে।

তবু কারে যাবার থেকে পায়দলে যাবার মাদকতাই আলাদা।

আঁকা ছবির মত চারদিকের দৃশ্যাবলী। ওরা গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে পাহাড়ী পথে সারি দিয়ে চলতে লাগল। চিত্রহার, রঙ্গোলী, কোন কিছুর গানই বাদ গেল না।

তিন্নি বলল, গানের সুরগুলো বেশ দোলা দেয় কিন্তু নাচের দিকে তাকানো যায় না একেবারে।

রত্নাবলী বলল, আমি ঐ সুরের সঙ্গে অনেকগুলো নাচ কম্পোজ করেছি। বন্ধুরা দেখে বলেছে, ওগুলো যেমন গতিশীল তেমনি রুচিশীলও।

তোমার কম্পোজ করা নাচগুলো দেখতে ভারি ইচ্ছে করছে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে গেলে আমাদেরও গতি বাড়াতে হবে কিন্তু সেজন্যে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের রিচ হেরিটেজকে বিসর্জন দেব না। অকারণ আড়ষ্টতা যেমন আজকের দুনিয়ায় অচল তেমনি গতির নামে উচ্ছৃঙ্খলতাকেও আমরা আঁকড়ে ধরব না।

ক্যারল বলল, তোমার কথাগুলোয় যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু আমার কি মনে হয় জান, এ ক্ষ্যাপামি একদিন বন্ধ হয়ে যাবে।

রত্নাবলী বলল, আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি ক্যারলকে। যার শেকড় নেই মাটির গভীরে সে গাছ কখনো বেশীদিন বাঁচতে পারে না। ফোক্ অথবা ক্ল্যাসিকেল, কোন নাচেরই সামান্যতম ছোঁয়া নেই ওসব নাচের ভেতর। টিন এজারদের দমিত যৌন ক্ষুধাকেই ওরা উদ্দাম নাচের ভেতর দিয়ে মুক্তি দিচ্ছে।

ওরা চারটি তরুণ-তরুণী ওদের জীবনের নানা ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করল। সিডার আর পাইন বনের ভেতর দিয়ে হাঁটল। কুন্তী আর ভাগ্তুরামের প্যাক করা খাবার পথের ধারে বসে মহা আনন্দে গল্প করতে করতে খেল।

প্রায় আড়াই হাজার মিটার উচ্চতায় বিজলী মহাদেবের মন্দির। খাড়া পাহাড়ী চড়াই ভাঙতে ভাঙতে ওপরে উঠতে হয়। বুক চড় চড় করে। ক্যারল আর অর্ক বেশ মজা করতে করতে ওদের কোথাও বা ঠেলে আবার কোথাও বা টেনে তুলল।

ওপরে উঠে রত্নাবলী বলল, বাব্বা চড়াই বটে।

ক্যারল বলল, এখানে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে যদি একটা ভরতনাট্যম্ মুখে বোল বলতে বলতে নেচে যেতে পার তাহালে…।

রত্নাবলী তখনও হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, অ-স-ম্ভ-ব।

তিনুনিও হাঁপাচ্ছিল। সে রত্নাবলীকে ঠ্যালা দিয়ে বলল, বোকা, তাহলে ও কি দেবে বলছিল তা জেনে নাও।

ক্যারল বলল, ও যা চাইবে তাই দিয়ে দেব। অবশ্য যা আমার আয়ত্তের ভেতর আছে।

তিনুনি রত্নাবলীর কানে কানে কিছু বলে দিলে রত্নাবলী বেশ জোরের সঙ্গে বলল, তাহলে প্রতিজ্ঞা পূরণ কর যুবক।

ক্যারল বলল, আগে নাচ।

অবশ্যই নাচব। তবে সবার সামনে আমার প্রার্থিত বস্তুটি দিতে স্বীকার করলে আমি নাচ শুরু করব।

ক্যারলেরও জিদ চেপে গেছে। সে জোরের সঙ্গে বলল, বল কি চাও?

দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে রত্নাবলী বলল, আমি তোমাকেই চাই মাই ডিয়ার।

ক্যারল প্রথমে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। অর্ক আর তিনুনি জোরে হেসে উঠল। শেষে ওদের হাসির সঙ্গে মিশে গেল ক্যারলের হা হা হাসির আওয়াজ।

একটুখানি বিশ্রামের পর চাঙ্গা হয়ে উঠল ওরা। উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল চারদিকের দৃশ্যাবলী।

অপূর্ব সুন্দর! পার্বতী আর কুলু উপত্যকাকে এখান থেকে স্পষ্ট চিনে নেওয়া যায়। মন্দিরের ওপর ষাট ফুট উঁচু একটি ধাতব দণ্ড রয়েছে। প্রসিদ্ধি আছে বার বছরের ভেতর অন্তত একবার ঐ দণ্ডের মাধ্যমে মন্দিরের ভেতর বিদ্যুৎ-সংযোগ ঘটে। তখনই চূর্ণ হয়ে যায় শিবলিঙ্গ। মন্দিরের পুরোহিত বহু যত্নে সংগ্রহ করেন সেই ভগ্ন প্রস্তরগুলি। তারপর বিশুদ্ধ মাখনে জোড়া দিতে দিতে আবার গড়ে তোলেন সেই পূর্বের শিবলিঙ্গটি।

এর পরের যাত্রায় ওরা গেল কুলু-মানালী হাইওয়ের ওপর কাতরাইন আর নাগগরে।

কাতরাইন উপত্যকাটি বেশ চওড়া। হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গগুলি এখানে বহুবিস্তৃত।

গভর্ণমেণ্ট ট্যুরিস্ট লজ ভাড়া করে রেখেছিল তিনুনি আর অর্ক। ওরা বিকেলে পৌঁছে বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরল হাতে হাত বেঁধে। হিমালয়ের চোখ জুড়ানো শোভা দেখল। পরের দিন কটেজের চৌকিদারকে ছুটি দিয়ে জলখাবার থেকে লাঞ্চ, সবই তৈরী করল নিজেরা।

জলখাবারে তৈরী হল, গরম গরম পরোটা আর ভিণ্ডি ভাজি। ক্যারল বসে বসে এই মেন্যু বাতলালো। তৈরী করল তিন্নি।

এক একখানা করে প্লেট সাজাল রত্নাবলী। পরোটা, আচার আর ভিণ্ডি ভাজি।

অকুস্থলে অর্ক গরহাজির। ক্যারল বলল, দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে, আমার প্লেট দাও।

ওকে খাবার দিয়ে রত্নাবলী কটেজের আশপাশ দেখে এল, অর্ক বেপাত্তা। ফিরে আসতেই তিন্নি রত্নাবলীর হাতে ধরিয়ে দিল তার প্লেট।

ক্যারল আর রত্নাবলী গল্প করতে করতে খেতে লাগল। সেই ফাঁকে নিজের প্লেটের খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে অর্কের প্লেট হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল তিন্নি।

অর্ক কিছুটা কবি স্বভাবের। তিন্নি লক্ষ্য করছে, ইদানিং অর্ক মাঝে মাঝে কেমন যেন অভিমানী হয়ে উঠছে।

আজ সকালে তিন্নিকে দূরের আপেল বাগানে বেড়াতে যাবার জন্য ইশারায় ডাক দিয়েছিল অর্ক। আর ঠিক সেই সময় কটেজের ভেতর থেকে ভোরের নাস্তা তৈরীর জন্য হাঁক দিয়েছিল ক্যারল। ভারি অদ্ভুত স্বভাবের ছেলে ও। যেমন বাবার মত বিশাল হৃদয় ওর, তেমনি মেজাজী, গোঁয়ারগোবিন্দ।

তিন্নি ভাল করেই চেনে ক্যারলকে। তাই সেই মুহূর্তে তার ডাককে উপেক্ষা করে অনাসৃষ্টি বাধাতে চাইল না। সে হাত নেড়ে অর্কের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। এখন অভিমানী অর্কের মান ভাঙানোর পালা তার।

আপেল বাগানের ভেতরে ঢুকে তিন্নি দেখল, বাগানের শেষসীমায় কয়েকটা পাইন গাছের জটলার তলায় ঝকঝকে হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে বসে আছে অর্ক। তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ঝোরা।

কাছাকাছি পেঁছে পা টিপে টিপে গিয়ে তিন্নি হাঁটুগেড়ে বসল অর্কের ঠিক পেছনে। খাবারের প্লেটটি নিচে রেখে একটুকরো পরোটা আর ভাজি হাতের আঙুলে মুড়ে নিয়ে বাঁ হাতে ওর

গলাটা জড়িয়ে ধরে খাওয়াতে গেল।

চমকে উঠে ফিরে তাকাল অর্ক।

তিন্নি বলল, বাব্বা, সঙ্গে আসিনি বলে এত অভিমান। এই নাও খাও।

তিন্নির মুখেচোখে গভীর অনুরাগের ছবি ফুটে উঠেছে।

অর্ক হাঁ করল। তিন্নি ওর মুখের ভেতর ভরে দিল খাবার। অর্ক চোখ বন্ধ করে তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল।

এক গ্রাস শেষ হলে চোখ খুলল সে। সামনে তার খাবার ভর্তি প্লেট। অমনি মাথা নেড়ে জানাল, তাকে খাইয়ে না দিলে সে খাবে না।

তিন্নি আবারও এক গ্রাস তার মুখে ঢুকিয়ে দিতে দিতে বলল, আমার খিদে পায় না বুঝি?

অর্ক খাবারটা কোন রকমে চিবিয়ে নিয়ে ঢোক গিলে বলল, সে কি! তুমি এখনও খাওনি!

রত্নাবলী তোমাকে কটেজের আশপাশে খুঁজে পায়নি। আমি ওদের দুজনকে খেতে বসিয়ে দিয়ে তোমার খাবারটা নিয়ে চলে এসেছি।

তুমি জানলে কি করে, আমি এখানে আছি?

আমি একজন পামিস্ট তাই।

অর্ক অমান তিন্নির চোখের সামনে হাতের পাতাটা তুলে ধরে বলল, বল তো আমার বিয়েটা গুরুজনদের যোগাযোগের, না ভালবাসার?

গম্ভীর মুখে অর্কের হাতের রেখাতে আঙুল চালিয়ে তিন্নি বলল, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভালবাসার বিয়ে।

নড়ে চড়ে বসল অর্ক। এবার বল, স্বদেশিনী না বিদেশিনী?

বিদেশিনী।

সে কি!

তুমি তো আইনত আমেরিকার বাসিন্দে। তাই বলছিলাম তোমার ভাগ্যে ভারতীয়, উগাণ্ডা অথবা চীনে বউ ঝুলছে।

অর্ক জোরের সঙ্গে বলল, আমি মনে প্রাণে ভারতীয় তিন্নি।

আমি যেখানেই থাকি না কেন আমার বউ হবে খাঁটি ভারতীয়।

তিন্নি বরদানের ভঙ্গীতে হাত তুলে বলল, তবে তাই হোক্। এখন দয়া করে খাবারটা শেষ কর।

খাব, একটি শর্তে।

এখানেও শর্ত ?

মুখ টিপে বসে রইল অর্ক।

তিন্নি বলল, রাজি, এবার বলে ফেল।

তুমি আমাকে একগ্রাস খাইয়ে দেবে, তার পরের গ্রাসটা আমি তোমাকে খাইয়ে দেব।

কিন্তু আমার খাবার যে পড়ে রইল ওখানে।

অর্ক বলল, ওখানে গিয়ে এমনি করে তোমার প্লেটটাও সাবাড় করব।

চোপ্, বড় লোভী আর সাহসী হয়ে উঠেছ।

দুপুরে লাঞ্চের পরে ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল নাগ্গর। অতি অল্প সময়ের ভেতর পেঁছে গেল রোয়েরিক আর্ট গ্যালারির সামনে।

ডান দিকে আর্ট গ্যালারির পর দশ-পা এগিয়ে গেলেই দুটি ফার গাছের মাঝখানে দুএক খণ্ড পাথর পড়ে আছে। শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক ঐ পাথর কেটে কিছু কাজ করতে চেয়েছিলেন।

এই নাগ্গর উপত্যকার শোভা অসাধারণ। গভীর পাইন অরণ্যে ছাওয়া পর্বত। দূরে দূরে নীলাভ পাহাড়গুলির গায়ে মসলিনের মত হিমেল ওড়না উড়ছে। নিচে সবুজ হলুদ শস্যের ক্ষেত। উপত্যকার ওপর দিয়ে উপবীতের মত বয়ে চলেছে বিপাশা। ওপরে গভীর নীল আকাশ।

ফারগাছ দুটির ফাঁক দিয়ে দেখলে সামনে দেখা যায় পীর পাঞ্জালের শুভ্র মহিমা। ডানদিকে চির তুষারাবৃত ধৌলাধার।

হাতে হাত বেঁধে চারজনে মূক বিস্ময়ে দেখতে লাগল প্রকৃতির মহিমা।

এই অপার বিস্ময়ে ভরা প্রকৃতির বুকেই রাশিয়ান শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক তাঁর সাধনার আসন পেতেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষকে জানতেন তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে। এই পৃথিবী-বিখ্যাত শিল্পীটি একাধারে কবি, দার্শনিক, পুরাতত্ত্ববিদ ও মানবপ্রেমিক।

তিনুনি বলল, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, অসুস্থ নিকোলাস সেখানেই তাঁর আর্মচেয়ারটি পেতে দিতে বলেছিলেন। ঐ চেয়ারেই অর্ধশায়িত অবস্থায় তিনি তাঁর রূপের জগতকে দেখতে দেখতে চির শান্তির আশ্রয়ে চলে যান।

ক্যারল বলল, আন্টি মানে তিনুনির মা এই আর্ট গ্যালারিতে কাজ করে গেছেন অনেক দিন। আমি ছোটবেলা প্রায়ই আসতাম এখানে।

তিনুনি বলল, শুনেছি ছেলেবেলা ভীষণ দুষ্টু ছিল ক্যারল। গ্যালারিতে ঢুকেই ও ছবি টানাটানি করত আর বলত, আমি এটা নেব আন্টি। মা ওর দাপাদাপি টানাটানিতে হিমসিম খেয়ে যেত। শেষে জুলিয়েন আংকেল পাশে এসে দাঁড়ালেই চুপ।

ক্যারল বলল, বাবা কিন্তু একদিনের জন্যেও আমার গায়ে হাত তোলেনি। কিন্তু বাবার এমন একটা পার্সোনালিটি আছে যার সামনে দাঁড়িয়ে বেশীক্ষণ চোখ তুলে কথা বলা যায় না।

তিনুনি বলল, বাইরের আবরণটা শক্ত হলে কি হবে, আংকেল ভীষণ স্নেহপ্রবণ।

রত্নাবলী বলল, এই কদিনের ভেতরেই আমি তা টের পেয়েছি।

অর্ক বলল, আমাদের ফাংশানের পরে আমাকে আলাদা ডেকে বললেন, আমি অবাক হয়েছি তোমার নাচের দ্রুতলয় আর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী দেখে।

রত্নাবলী হাসতে হাসতে বলল, আমাকেও আংকেল একটি মজার কথা বলেছিলেন। আমি তা গোপন করে রেখেছি।

তিনুনি বলল, শিগ্‌গির বলে ফেল।

ফাংশান শেষ হবার পর আমাকেও আংকেল বলেছিলেন, তুমি আর অর্ক আজ যে নাচ কম্পোজ করে দেখালে তাতে ইস্ট ওয়েস্টের

অপূর্ব মিলন ঘটেছে। তোমরা দুজনে এরকম নাচ কম্পোজ করে, সর্বত্র দেখাও আর বিশ্বজয় কর।

তিনুনি আর ক্যারল প্রায় একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল।

ক্যারল বলল, আমরাও তাই চাই।

তিনুনি বলল, অবশ্যই, অবশ্যই। আমরা জানি, আংকেল যে কথাই বলেন, তা মনের গভীর থেকেই বলেন। তোমাদের ভেতর সে সম্ভাবনা তিনি নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছেন।

বসন্ত-পূর্ণিমার সন্ধ্যা। চাঁদের আলোর জোয়ার উঠেছে। চা পানের পর এক মজার কাণ্ড করে বসল ক্যারল।

সে বলল, এসো আমরা জ্যোৎস্না রাতে নিজেদের মনের মত একটি করে নারী অথবা পুরুষ বেছে নিয়ে ঘুরি। জোড়ায় জোড়ায় ঘুরব, চারজন একসঙ্গে নয়।

হাসির ঢেউ আছড়ে পড়ল চায়ের টেবিলে।

তিনুনি বলল, আমরা দুজন মেয়ে আর দুজন ছেলে আছি। এখন ঠিক করতে হবে ছেলেরা না মেয়েরা নির্বাচন করবে।

ক্যারল অর্কের সঙ্গে নিচুগলায় কিছু পরামর্শ করে নিয়ে বলল, তোমাদেরই নির্বাচনের সুযোগ দিলাম, তবে লটারির মাধ্যমে।

রত্নাবলী বলল, কি রকম?

দুটো কাগজে আমার আর অর্কের নাম লেখা থাকবে। একটা পাত্রে ফোল্ড করে রাখা হবে ও দুটো। তোমাদের ভেতর যে কেউ ওর থেকে একটা নাম তুলবে। বাকিটা অন্যজনের।

তিনুনি বলল, আমাদের ভেতর কে আগে তুলবে?

অর্ক বলল, সেটা খুবই সোজা, টস করে স্থির করব।

সমস্ত ব্যাপারটা পাঁচ মিনিটের ভেতর চুকে গেল।

ক্যারল লটারি শুরুর আগেই একটা ঘোষণা করে দিয়েছিল, আমরা আজ সঙ্গী হিসেবে যাদের পাব তারা কেবল আজ রাত-টুকুর মত আমাদের হৃদয়ের সব থেকে কাছের মানুষ হবে। কাল ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে এ খেলা শেষ হয়ে যাবে।

অর্ক তিনুনির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। তারা ফরেস্ট বাংলোর

পেছনে একটা শিলাস্তূপের আড়ালে গিয়ে বসল। ভেসে যাওয়া চাঁদের আলোয় ঋতু বসন্তের রঙীন ফুলগুলি পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে উঁকি দিচ্ছিল। ওরা পাইন বনের ফাঁকে তুষার পর্বতের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। পাইনের পিচ্ছল পাতা থেকে চাঁদের আলো পিছলে পড়ছিল ওদের গায়ে। গরম পোশাকে গা ঢাকা থাকলেও বরফ-ছোঁয়া হাওয়ায় মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল সারা শরীর।

অর্ক শীতের দেশের বাসিন্দে, তাই শীতবোধ কম। কিন্তু আজ সন্ধ্যার বাতাসে শীতের তীক্ষ্ণতা ছিল।

তিন্নি গরম পোশাক পরলেও গায়ে চাপিয়ে এসেছিল একটি পশমিনা শাল। এটি তার মা একসময় ছবি আঁকার জন্য কাশ্মীরে গিয়ে বাবাকে জন্মদিনের উপহার দেবে বলে কিনে এনেছিল।

সেটি বাবার স্মৃতি হিসেবে দু'বছর ব্যবহার করছে তিন্নি।

নিজের গা থেকে শালটা খুলে নিয়ে তিন্নি অর্কের গায়ে চাপিয়ে দিল।

অর্ক চমকে উঠে বলল, সে কি! তুমি শীতে কাঁপবে আর আমি গায়ে শাল চড়াব।

আমার গায়ের পোশাক একটা সাদা দামী পাট্টু (কম্বল)। ব্রোচ দিয়ে টাইট করে আঁটা। এ পোশাকে শীত আটকায়। ডিসেম্বর জানোয়ারীতেও কুলু ভ্যালিতে মেয়েরা এই পোশাকই পরে থাকে। মানালীতে শীত একটু বেশী, তাই একটা কুলু-শাল জড়িয়ে নেয় গায়। আমি দরকার হলে বাবার পশমিনাটা গায়ে চাপাই।

অর্ক বলল, তুমি পশমিনাটা গায়ে দিয়ে বস আর আমি তোমাকে ছুঁয়ে থাকি, তাতেই গা গরম হয়ে যাবে।

ঝর্ণার মত শব্দ করে হেসে উঠল তিন্নি।

হাসি থামলে বলল, পশমিনাটা কেনার সময় মাকে দোকানদার বলেছিল, আপনি এর ভেতর আস্ত একটা আণ্ডা রেখে দেবেন, দশ মিনিটে সেদ্ধ হয়ে যাবে।

অর্ক বলল, দারুণ কথা তো। তোমার মা কোনদিন পরীক্ষা

করে দেখেছেন ?

পাছে পশমিনার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় তাই মা পরীক্ষার ভেতর যেতে চায় না। বলে, বিশ্বাস করে নিলে একটা লাভ আছে। শীতকালে গায়ে জড়ালে প্রচণ্ড গরমবোধ হবে।

অর্ক বলল, এটা একটা সুন্দর অনুভূতি, যার জন্ম বিশ্বাস থেকে।

বাবা কিন্তু এ নিয়ে মাকে খুব ক্ষ্যাপাতো।

কি রকম ?

পাঁচ মিনিটের ভেতর ডিমের একটা হাফ্ বয়েল করে দাও তো খেয়ে বেরিয়ে যাই।

মা বলতো, অত তাড়াতাড়ি কি করে সম্ভব হবে। স্টোভ ধরিয়ে কেট্লিতে ডিম ফেলে জল গরম করতে হবে তো। পনেরোটা মিনিট অন্তত সময় চাই হাতে।

বাবা বলতো, আরে সে পশমিনাটা কোথায় গেল, পাঁচ মিনিটেই ওর ভেতর থেকে হাফ্ বয়েল ডিম বেরিয়ে আসবে।

কথাটা শুনে অর্কের হাসি আর থামে না।

হাসি থামলে অর্ক বলল, আমরা কেউ একজন যখন এ শাল গায়ে দিতে পারব না, তখন এসো আমরা এটিকে ভাগাভাগি করেনি।

একই শাল গায়ে জড়িয়ে বসল দুজনে। একান্ত সান্নিধ্যে অথবা শালের গুণে ধীরে ধীরে তাপ ছড়িয়ে পড়ল দুজনের ভেতর।

হাতে হাত বেঁধে বসে রইল ওরা। কতক্ষণ কারু মুখে কোন কথা নেই।

প্রথম কথা বলল অর্ক, আমরা যদি এমনি করে অনন্ত সময় হাতে হাত বেঁধে বসে থাকতে পারতাম।

তিন্নি একথার উত্তর না দিয়ে বলল, জানো অর্ক, এই মুহূর্তে আমি রোমাঞ্চিত হচ্ছি একটি কথা ভেবে।

কি সে কথা তিন্নি ?

বিয়ের আগে আমার মা আর বাবা এই ফরেস্ট বাংলোতে

একরাত্রি কাটিয়ে গেছে। এই বনে ঘুরে বেড়িয়েছে আমাদেরই মত হাত ধরাধরি করে। একটু আগে বন-জ্যোৎস্নায় আমি যেন তাদেরই দৃষ্টিতে দেখছিলাম। তাদের সেদিনকার রোমাঞ্চিত মনের সুরভি বনকুসুম আর বনজ্যোৎস্নায় মিশে আছে। আমি সেই গন্ধ জ্যোৎস্নার জলে স্নান করতে করতে প্রাণভরে টানছি অর্ক।

এ রাত, এই আবেগভরা মুহূর্ত কি চিরদিনের হতে পারে না তিন্নি ?

এ জিজ্ঞাসা তোমার আমার মনের ভেতর যতদিন থাকবে তত-দিনেই আমরা বেঁচে থাকব দুজনের ভেতর। এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলে আর এমন আকুলতা থাকবে না অর্ক। যে রাত আজ আমাদের এমন করে পাশাপাশি টেনে আনল তাকে হৃদয় ভরে উপভোগ করি এসো দুজনে।

একটি চুম্বনের স্বাদ থেকে এ রাতে কি আমি বঞ্চিত থাকব তিন্নি ?

আমার সারা মন তোমার কথারই প্রতিধ্বনি তুলছে অর্ক। কিন্তু…।

আবার দ্বিধা কেন তিন্নি ?

সেই পুরানো উপমা দিয়েই বলি, আগুনে একবার আহুতি দিলেই তার জিভ লক্‌লক্‌ করে উঠবে। সে তখন হয়ে উঠবে সর্বগ্রাসী। তুমি স্থির হও অর্ক। এর আগেও আমি তোমাকে সুস্থির হতে বলেছি। এ রাতটা নিবিড় উত্তাপে দুজনে উপভোগ করি এসো।

ক্যারল চলে গেছে অনেকটা নিচে। একটা মসৃণ, প্রশস্ত জায়গায় একপ্রান্তে বসেছে ওরা। ঝর্ণাটা একটু দূর দিয়ে বইছে। পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে ধাপে ধাপে নেমে চলেছে ঝর্ণাটা। ঝিলমিল করছে জল। মনে হচ্ছে রূপার নূপুর পরে কোন জলকন্যা নাচতে নাচতে চলেছে।

ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্যারল হঠাৎ রত্নাবলীর দিকে ফিরে বলল, আজ রাতে ঐ ঝর্ণার মত তুমি নাচ আর আমি বসে

বসে তোমার নাচ দেখি।

রত্নাবলী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা যে শিলাখণ্ডের ওপর রয়েছি, এক সময় এর ওপর দিয়ে বইত ঐ ঝর্ণা, তাই এই শিলাটি এত মসৃণ।

ক্যারল বলল, তাহলে ঠিক জায়গাই নির্বাচন করেছি আমরা। তোমার ভেতর শুরু হোক ঐ নৃত্যপটিয়সী ঝর্ণারই লীলা।

ব্যাগ থেকে নূপুর বের করল রত্নাবলী।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যারল বলল, তোমার পায়ের নূপুরটা আজ আমাকে বেঁধে দিতে দাও।

রত্নাবলী পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল ক্যারলের দিকে। অনুত্তেজিত গলায় বলল, তুমি কেন আমাকে চঞ্চল করে তুলতে চাও ক্যারল। তোমার বাগদত্তা আমারও প্রিয়।

রত্নাবলী, আমরা কি আজ স্থির করিনি এ রাত তোমার আমার ? আমি অন্য কিছু তো চাইনি, আর চাইবওনা তোমার কাছে, শুধু নূপুরখানা পরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। তুমি জানো, আমি তোমার নাচের এক অন্ধ ভক্ত, তাই সংকোচ না করে বলতে পেরে-ছিলাম।

নর্তকী রত্নাবলী এবার অপূর্ব এক মুদ্রায় বাম পদের ওপর বসে দক্ষিণ চরণ সামনে প্রসারিত করল। অঞ্জলিতে নূপুর নিয়ে সে হাত দুটি তুলে ধরল ক্যারলের দিকে।

তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত ক্যারলের মুখ। সে দুহাতে ধরে নিল রত্নাবলীর নূপুর।

প্রথমে প্রসারিত ডান পায়ে, পরে একই ভঙ্গীতে প্রসারিত বাম পায়ে নূপুর দুটি বেঁধে দিল ক্যারল।

এবার নত হয়ে রত্নাবলী নাচের ভঙ্গীতে নমস্কার নিবেদন করল বন্ধুকে।

দীর্ঘ সময় ধরে চরণে তাল দিয়ে মুখে বোল তুলে নাচতে লাগল রত্নাবলী। তার নূপুরের ঝংকারে মনে হল ঝিনিঝিনি শব্দে বয়ে চলেছে ঝর্ণা। কখনো সাগর তরঙ্গের মত সারা দেহে ঢেউ তুলে নাচছে। আবার কখনো বা নিবেদনের ভঙ্গীতে আছড়ে

পড়ছে বালুকা বেলায়।

আপন মনে তরঙ্গে দোল খাচ্ছে এক সুসজ্জিত তরণী। বায়ু বেগে সঞ্চরণ করছে ইতস্তত। আবার কখনো প্রেমমত্ত কেকার মত থরথর কম্পনে বিস্তার করছে সম্পূর্ণ কলাপ।

নৃত্যের এত বিভঙ্গ, এত মহিমা যেন অমৃত ধারার মত গড়িয়ে পড়ছে মোহিনীর স্বর্ণকুম্ভ থেকে।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নর্তকীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যারল। মনে মনে ভাবছে, এই নৃত্যপটিয়সীর একমাত্র সঙ্গী হতে পারে প্রতিভাধর নৃত্যশিল্পী অর্কদীপ।

নাচ থামল। অদূরে ঝর্ণা যেন কলকল শব্দে করতালি দিল। বায়ুর স্বননে পাইনের বনে উঠল আনন্দের উচ্ছ্বাস।

ক্যারল রত্নাবলীর হাত ধরে বলল, তোমাব সঙ্গে পরিচয়ের পর যত অনুষ্ঠান তোমার দেখেছি, আজকের অনুষ্ঠান সে সবকে ছাপিয়ে গেছে রত্নাবলী।

ক্যারলের দুটি হাত ধরে রত্নাবলী বলল, প্রকৃতির এই অসাধারণ মঞ্চ আর বন্ধুর পলকহীন দুটি চোখের দৃষ্টি আমার নাচকে সারাক্ষণ প্রেরণা দিয়ে গেছে ক্যারল।

ড্যাডি তোমাদের পারফরমেন্স দেখে ঠিকই বলেছে, ইস্ট ওয়েস্টের মেল বন্ধন হয়েছে তোমাদের নাচে। তোমরা দুজনে নাচের ভেতর দিয়ে বিশ্ব ঘুরে মিলনের সেতু রচনা করতে পার।

রত্নাবলী অসংকোচে বলল, আঙ্কেলের আশীর্বাদকে আমি মাথায় ধরে রেখেছি, কিন্তু ক্যারল, অর্ক কি এ পরিকল্পনার সামিল হবে?

সে তোমার অত্যন্ত গুণগ্রাহী রত্নাবলী। আমি তার বন্ধু তিনুনির মুখ থেকে এ কথা শুনেছি। আর তাছাড়া…।

থামল ক্যারল।

রত্নাবলী সাগ্রহে জানতে চাইল, তা ছাড়া কি ক্যারল?

ও এখানে এসেছে মনোমত একটি সঙ্গিনী বেছে নিয়ে যাবার জন্য। তুমি কেবলমাত্র সুন্দরীই নও, ডাক্তার হতে চলেছ আর এই বয়সেই একজন গুণী শিল্পীর মর্যাদা পেয়েছ। তোমার বাবা

সংস্কারমুক্ত মানুষ। তুমি তার একটিমাত্র মেয়ে। তোমার ইচ্ছাকে কখনই তিনি অপূর্ণ রাখবেন না।

রত্নাবলী বলল, তোমাকে আমি গভীরভাবে ভালবাসি ক্যারল। তুমি শুধু আমার বন্ধু নও প্রিয়ও। আমার পক্ষে যা কিছু শুভ তাই তুমি করবে, এ বিশ্বাস আমার রয়েছে।

ক্যারল বলল, জজসাহেবের বাড়ীতে যেদিন আমরা লাঞ্চের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, সেদিন অর্কের নানি তোমাকে কিভাবে আদর করে জড়িয়ে ধরেছিলেন দেখেছ?

আমি সেদিন নানির আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম ক্যারল।

অর্কের সঙ্গিনী হিসেবে তোমাকে বেছে নেবার প্রবল ইচ্ছাই ছিল সেদিনের ব্যবহারে।

তা হতে পারে, আমি ওদিক দিয়ে কিছু ভাবিনি তখন।

এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার ড্যাডি আর তিনানির মমের ওপরেই ছেড়ে দাও।

হঠাৎ পেছন থেকে হাসির শব্দের সঙ্গে তিনানির গলা ভেসে এল, বেশ জমিয়ে গল্প হচ্ছে দেখছি।

ক্যারল বলল, কেউ কাউকে আজ রাতে ডিসটার্ব করব না এমন একটা অলিখিত শর্ত ছিল।

তিনানি বলল, আরও একটা শর্ত ছিল, বারটায় ডিনারে বসব, সে সময় এক ঘণ্টার জন্য খাবার টেবিলে চারজনের মিলন হবে। এখন ঘড়ির দিকে তাকাও, জাস্ট বারোটা।

ক্যারল বলল, সরি তিনানি।

শোবার সময় দুটি বেড ওরা জোড়া লাগিয়ে দিল। দুদিকে ক্যারল আর অর্ক, মাঝে দুই বান্ধবী। চারটি কম্বলে গা ঢাকা দিয়েছে চার জন।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডার প্রকোপও বাড়তে লাগল। নিশ্ছিদ্র ঘুমের জগতে ধীরে ধীরে ডুবে যেতে লাগল ওরা।

তিনানি আপার বিয়াস ভ্যালির বাসিন্দা হলেও শীতকাতুরে। দামী দুটো কম্বল গায়ে না চাপালে তার রাত কাটে না। ফরেস্ট

বাংলোতে সে ব্যবস্থা নেই। একটি করে কম্বল অতিথিদের জন্য বরাদ্দ। শীত ঋতুতে এখানে টুরিস্টের আসার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই অতিরিক্ত কম্বল রাখার দরকার বোধ করেন না কেয়ার-টেকার।

ক্যারল কিংবা অর্কের শীতবোধ তুলনায় অনেক কম। রত্নাবলী কেরলের মেয়ে। নাতিশীতোষ্ণ জায়গায় তার বাস। নাগগরের শীতে তার কাবু হয়ে পড়ারই কথা। কিন্তু এমনিতে তার সহ্যশক্তি প্রবল। তাছাড়া সারা দেহ গরম পোশাকের বর্মে এঁটে সে শুয়েছে। এটি আবার তিন্নির পক্ষে অসহ্য। সে তার শরীরকে হালকা না রেখে শুতেই পারে না।

মাঝরাতে শীতের দাপটে ঘুমের ঘোরে সে অর্কের কম্বলের কিছুটা টেনে নিল নিজের গায়ে। অর্কও কিছুটা শীত বোধ করায় ঘুমের ঘোরে কম্বলের টানে জড়িয়ে ধরল তিন্নিকে।

এখন নিবিড় একটা উত্তাপে ভরে উঠেছে তিন্নির সারা শরীর। সে বড় আরামে অর্কের বাহুর ভেতর নিজেকে সঁপে দিয়ে অঘোরে ঘুমুতে লাগল।

কখন ভোর হয়ে গেছে। সকালের আলো পীরপাঞ্জালের মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়ে, পাহাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাইন বনকে সোনার ঝরণার জলে স্নান করিয়ে, ফরেস্ট বাংলোর সবুজ ঘাসের লনে এসে সোনালী ওড়নার মত লুটিয়ে পড়েছে। তারই ওপর সাদা বেতের একটা চেয়ারে একা বসে আছে ক্যারল। অপূর্ব ভরাট মুখখানাতে ঘনিয়ে উঠেছে ব্যথার একটা ছায়া।

যে সোনালী মৌমাছি তাকে প্রতিদিন গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছে, সে হঠাৎ কখন অগোচরে তার বুকের ভেতর বিঁধে দিয়ে গেছে বিষে ভরা সূক্ষ্ম একটি হুল। সে ঐ ছোট্ট হুলটিকে কোন ভাবেই বুকের বাইরে বের করে আনতে পারছে না। এমন শক্তিমান দিলদার এক যুবক শিশুর মত অসহায় আর কাতর হয়ে পড়েছে যন্ত্রণায়।

প্রথম ঘুম ভেঙেছিল ক্যারলের। সে ছোটবেলা থেকেই আর্লি রাইজার। যদিও অনেক রাত করে শুয়েছিল তারা, তবু কারু ঘুম

না ভাঙলেও ক্যারল বহুদিনের অভ্যাস বশে জেগে উঠেছিল।

কাচের জানালার ভারি একটা পর্দা সরিয়ে দিতেই ভোরের নীলাভ সাদা আলো ঢুকে পড়েছিল ঘরের ভেতর। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার এতদিনের প্রিয় মৌমাছিটির তীব্র দংশনজ্বালা অনুভব করেছিল সে। এরপর ঐ যন্ত্রণা নিয়েই সে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে।

ক্যারলের ঠিক পরেই জেগেছিল অর্ক। সে অতি সন্তর্পণে মুক্ত করে নিয়েছিল তার বাঁধন। দুটি কম্বল ভাল করে জড়িয়ে দিয়েছিল তিনুনির গায়ে। তারপর পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছিল পাইন বনে প্রাতর্ভ্রমণে। স্বপ্নের মত একটা স্মৃতির গন্ধ তার সমস্ত মনটাকে আবেশে ভরে রেখেছিল।

রত্নাবলী জেগে উঠেই দেখল দুটি বন্ধু ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেছে। সে সমস্ত আলস্য নিয়ে জড়িয়ে ধরল তিনুনিকে।

জাগো সখি জাগো, ভোরের সূর্য তোমাকে উত্তপ্ত চুম্বন দিতে চাইছে।

অপূর্ব সুন্দর এক ভঙ্গীতে আলস্য ভাঙল তিনুনি। নির্মল মুখখানা আধফোটা বসন্ত-মঞ্জরীর মত হাসি ছড়াল।

সহসা লন থেকে শোনা গেল ক্যারলের গলা, তৈরী হয়ে নাও, গাড়ি এখুনি মণিকরণে যাবে।

ভীষণ জেদি আর খেয়ালী ও। সুতরাং ওরা তড়িঘড়ি গোছগাছ শেষ করে চায়ের টেবিলে হাজির হল। ওখান থেকে ওরা ডাকতে লাগল ক্যারলকে কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না।

অর্ক ক্যারলকে ডেকে আনতে যাচ্ছিল, তিনুনি তাকে বসতে বলে নিজেই ক্যারলের চা বিস্কুট নিয়ে লনে চলে গেল।

লনে ক্যারল নেই। তখন ও চলল, আরও নিচে গাড়ির কাছে।

গাড়ির ভেতর চুপচাপ স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল ক্যারল।

সামনে গিয়ে তিনুনি বলল, কি হল তোমার, চায়ের টেবিলে এলে না? এই নাও তোমার চা।

ক্যারল বলল, কে তোমাকে এখানে আমার জন্যে চা বয়ে আনতে বলেছে? আমার চায়ের প্রয়োজন নেই। সবাই তাড়া-

তাড়ি নেমে এলে আমার সুবিধে হয়।

তিনুনি ক্যারলের মুখ থেকে এমন কঠিন শব্দ আশা করেনি। সে চোখ ভরা জল নিয়ে ওপরে উঠে গেল।

মণিকরণে উষ্ণ প্রস্রবণ দেখে ওরা চলে গেল জারি নামের একটি পাহাড়ী গ্রামে। অনন্য সৌন্দর্যে ভরা পার্বতী উপত্যকায় মণিকরণ আর জারি। এখানে প্রধান নদী পার্বতী। বইছে উপত্যকার ওপর দিয়ে, ঘন পাইন বনের ভেতর দিয়ে, আবার কখনো গভীর গিরিখাতের অগম্য আধো অন্ধকার পথে।

এ অঞ্চল দেবী পার্বতীর নামে নামাঙ্কিত। এখানে পাহাড়ী মানুষরা মনে করে স্বয়ং মহাদেব মণিকরণে দেবী পার্বতীর সঙ্গে বিহার করেন।

কাহিনী আছে, একসময় বিহার কালে দেবীর মণিকুণ্ডলটি পড়ে যায়। দেবী সেটি খুঁজে না পেয়ে বড় কাতর হন। আসলে সেই মহামূল্য কুণ্ডলটি পাতালে হরণ করে নিয়ে যায় শেষনাগ।

দেবীর কাতরতা দেখে মহাদেব তপস্যায় বসেন। তাঁর উগ্র তপস্যায় ভীত হয়ে শেষনাগ নতমস্তকে দেবীর মণিকুণ্ডলটি ফিরিয়ে দিয়ে যায়। সেই থেকে স্থানটির নাম হয়েছে মণিকরণ।

এই মণিকরণ নামটির মাহাত্ম্য জানার পর রত্নাবলী তিনুনির কানে কানে একটি কথা বলেছিল, তুমি নিশ্চয়ই তোমার প্রেমরত্নটি কোথাও হারিয়েছ, তাই উগ্রতপস্যায় তোমার মহাদেবটি মৌন হয়ে আছেন। তোমার প্রেমরত্নটি স্বস্থানে ফিরে এলেই তাঁর মৌনব্রত ভঙ্গ হবে।

এই সামান্য একটুখানি কথায় যেন একটা আলোর ঝলক দেখতে পেল তিনুনি। একদিনের খেলার ছলে সে কি অর্কের হৃদয়কে অনুরাগের স্পর্শমণি দিয়ে ছুঁয়ে দেয়নি? অথবা তার অজ্ঞাতেই কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও কি তার ভালবাসার কোয়েল অন্য কারু হৃদয়-নন্দন বনে ডাক দিয়ে আসেনি?

দুজনে যখন পাইন বনের ভেতর জ্যোৎস্নাধারায় স্নান করতে করতে কখনো কথায়, কখনো গানে মত্ত হয়েছিল তখন কি তাদের সেই মন হারানোর ছবি ধরা পড়েছিল কারু চোখের আয়নায়?

অথবা গভীর শীতের রাতে দুটি তরুণতরুণীর নিকট সান্নিধ্যে শুয়ে থাকার দৃশ্য কি কারু হৃদয়ে যন্ত্রণার ঢেউ তুলেছিল ?

না, এসব নিয়ে আর কিছু ভাবতে পারছে না সে। একদিনের প্রেম প্রেম খেলা যদি তারা করে থাকে তাহলে সে খেলার পরিকল্পনা যে করেছিল, তার কোনভাবেই ক্ষুব্ধ হওয়া সাজে না।

ছোট্ট গ্রাম জারির দৃষ্টিনন্দন শোভা দেখে দুদিন পরে সবাই ফিরে এলো কুলুর আউট হাউসে।

একটি রাত কাটতে না কাটতেই খেয়ালী ক্যারল বলল, ভাগ্তুদাদা, দশ বারো বছর বয়সে আমি ড্যাডির সঙ্গে প্রথম যখন এ বাড়ীতে আসি তখন ডাক্তার আঙ্কেল আর আণ্টির সঙ্গে আমরা একদিন নদীর ধারে সুন্দর একটি টেণ্ট টাঙিয়ে পিকনিক করে-ছিলাম। তুমিও সঙ্গে ছিলে। সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে তাঁবুটাও এ বাড়িতে ফিরে এসেছিল। সেটা কি এখনও আছে ?

নিশ্চয়ই। আমি এখানে এলেই ওটিকে রোদ্দুরে দিয়ে খুব যত্নে প্যাক করে তুলে রাখি।

আমরা যদি রাইসনে গিয়ে দুদিন বিপাশার কুলে তাঁবু ফেলে থাকি তাহলে তুমি কি তাঁবুটা দেবে ?

ভাগতুরাম বলে উঠল, সে কিরে, ওটা তো মানুষের থাকার জন্যই তৈরী হয়েছে। মানুষ না থাকলে পোকায় থাকবে। তোরা নিয়ে গেলে তাঁবুটা তবু দুদিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

দারুণ খুশীতে হেসে উঠল অর্ক আর রত্নাবলী।

বাজার থেকে দুদিনের ফুল র‍্যাশন নেওয়া হল। তাঁবু বাঁধা হল গাড়ির ছাদে।

একটুও কথা না বলে তিন্নি পেছনের ক্যারিয়ারে ভাগ্তুদাদার তদারকিতে গুছিয়ে তুলল র‍্যাশন।

একেবারে একান্তে পেয়ে ভাগ্তুরাম জিজ্ঞেস করল, হাঁ রে তিন্নি কাল থেকে তোকে এমন মনমরা দেখছি কেন ? কি হয়েছে তোর ? সোনাদিদি আমাকে খুলে বল।

তিন্নি শুধু তার একরাশ কোঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে তেমনি মুখ নিচু করে র‍্যাশন গোছাতে লাগল।

বলবি না আমাকে ? জানিস, কাল সারাটা রাত তোর দুঃখী, দুঃখী মুখখানা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠেছে। আমি এক দণ্ডের জন্যেও চোখ বন্ধ করতে পারিনি।

তিনুনি উঠে দাঁড়িয়ে ভাগতুদাদার বুকে মুখ লুকিয়ে একরাশ চোখের জল ঝরিয়ে দিলে।

কে তোকে আঘাত দিয়েছে ?

বুকের ভেতর থেকে মুখ তুলে তিনুনি বলল, তুই তাকে কিছু বলবি না বল ?

কথা দিচ্ছি।

ক্যারল আমার সঙ্গে তিনদিন কোন কথা বলছে না। আলোচনা করতে হলে রত্নাবলীকে ডেকে ডেকে করছে।

ভাগতুরাম ব্যাপারটাকে অতি লঘু করে দিয়ে বলল, দূর পাগলি, আমি ভাবলাম আর কিছু। ক্যারলকে ছেড়ে অন্য কাউকে মনটন দিয়ে বসে আছিস।

অমনি গুমগুম করে কয়েক ঘা কিল পড়ল ভাগতুরামের বুকে।

আরে ওটাও তো একটা পাগলা। ঠিক ওর বাবার মত। একটুতেই আগুন ঝরাবে, পরক্ষণেই বরফ। ভালবাসার নদী বইয়ে দেবে। তুই ওর ওপর অভিমান করে বসে আছিস !

এই তিনদিন পরে ভাগতুরামের কথায় ভারি একটা শান্তি পেল তিনুনি। ক্যারলের চরিত্র যে তার অজানা তা নয়, তবু বাবার বড় আদরের মেয়ে তাই সামান্য অবহেলাও বুকে বড় বেশী করে বাজে।

রাইসনের এদিকে ওদিকে পাহাড়ের চূড়াগুলি তখনও ধবধবে তুষারে আবৃত। তাউন্দি বা গরমকালে মধ্যাহ্নের পর সূর্যরশ্মি আর ধূলিকণায় এক ধরনের আবরণ তৈরী হয়। ওগুলি হালকা ওড়নার মত দুলতে থাকে। দূরের দৃশ্য এ সময় স্পষ্ট দেখা যায় না। তাউন্দিতে সূর্যকিরণ বড়বেশী উত্তাপ ছড়ায়। দিনের কোন কোন সময়ে, বিশেষ করে সন্ধ্যায় সারা ভ্যালির ওপর দিয়ে বইতে থাকে ভারি মিষ্টি একটা হাওয়া। জল কিন্তু সব সময়ই

ঠাণ্ডা থাকে।

রাইসনে ঢুকে গাড়ি থামাল ক্যারল। সবাই নেমে পড়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। ভারি শান্ত আর নির্জন এই উপত্যকা। এর উচ্চতা নাগ্গর থেকে বেশ কিছুটা কম।

ক্যারল বলল, জায়গাটা খুবই নির্জন, তবু এখানে বাস, প্রাইভেট কারের যাতায়াত আছে। কম হলেও সরকারি হাটে লোকজন এসে ওঠে। আমরা যদি নদী পেরিয়ে ওপারে যাই আর ঐ যে পাহাড়ী বন দেখা যাচ্ছে, তার তলায় নদীর গা ঘেঁষে তাঁবু ফেলি তাহলে কেমন হয়?

সবাই হৈ হৈ করে উঠল, দারুণ, দারুণ আইডিয়া।

অর্ক বলল, কিন্তু নদী পারাপার কিভাবে হবে?

কিছু দূরে একটা কাঠের পুল আছে পাহাড়ী মানুষজনের পারাপারের জন্য। ওরা মাঝে মধ্যে ওপারের বন থেকে কাঠ কেটে আনে। পুলটা একটু নড়বড়ে তবে পারাপারের অসুবিধে হবে না।

গাড়ির কি হবে?

ক্যারল হেসে বলল, ড্রাইভার, প্যাসেঞ্জার না থাকলে ও আর যাবে কোথায়, এখানেই পড়ে থাকবে।

অতএব মেয়েরা সবাই র‍্যাশনের ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। তাদের পেছনে তাঁবু বয়ে নিয়ে চলল অর্ক আর ক্যারল।

পুলটা সংকীর্ণ। কাঠগুলোও জীর্ণ, নড়বড়ে। অনেককাল মেরামতি হয়নি।

পুলের নিচে বড় বড় বোল্ডার পড়ে আছে। বিপাশার জল সেখানে ধাক্কা খেয়ে ফুঁসে উঠছে। পাক খেতে খেতে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে।

ওরা ঐ জীর্ণ পুলটার ওপরে দাঁড়িয়ে নীল জলস্রোতের খেলা দেখল। তারপর সাবধানে পা ফেলতে ফেলতে পেরিয়ে গেল ওপারে।

তাঁবু পড়ল গাছের তলায় সবুজ ঘাসের ওপর। ঘাসের বেড়ের তিন চার হাত দূর দিয়ে নদী বইছে।

খাবার দাবার তৈরী করে মেয়েরা চলল স্নানে। আজ মধ্যাহ্ন হতে না হতেই রোদ্দুরের তেজ প্রবল।

পুলের তলায় ছোটবড় পাথর জমে আছে। সেগুলোর গা ছুঁয়ে, কখনো বা পাথর উপচে জল ছুটে চলেছে।

ওরা পুলের তলায় পোশাক রেখে স্নান সারল। বাইরের গরমে গা জ্বলছিল, এখন ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়ায় দেহ জুড়িয়ে হিম।

ওরা স্নান সেরে পোশাক পরে কলরব করতে করতে চলে গেল। ভেজা পোশাক গাছের ডালে, ঘাসের জমিনে শুকুতে লাগল।

অর্ক আর ক্যারল গেল স্নান করতে। একটা শিলার ওপর দাঁড়িয়ে জলে একখানা পা ডোবাল অর্ক। সে বুঝে নিল প্রবল স্রোত আব ঠাণ্ডায় জলে নেমে স্নান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ শিলার ওপর বসে কোনরকমে স্নান সারল সে।

কিন্তু আশ্চর্য দুঃসাহসী ছেলে এই ক্যারল। সে ব্রীজের কিনারার কাঠে ঝুলতে ঝুলতে মাঝ নদী অব্দি চলে গেল। তার-পর ঝাঁপিয়ে নামল একটা উঁচু শিলাস্তূপের ওপর। এবার সেটার একটা খাঁজের পাথর এক হাতে ধরে নদীতে শরীর ভাসিয়ে স্নান করল। স্নান শেষে আবার লাফিয়ে ধরল কাঠের সেতুর কিনারা। তেমনি দুহাতের জোরে ঝুলন্ত শরীরটাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল কূলে।

ওর কীর্তি দেখে ঘন ঘন হাততালি দিতে লাগল অর্ক।

তালির শব্দ শুনে ওরা দুবান্ধবী ছুটে এল গাছতলা থেকে। ততক্ষণে চোস্ত পরে হলুদে একটা গেঞ্জি গায়ে জড়িয়ে সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর মত নীলাকাশের তলায় দাঁড়িয়ে হাসছে ক্যারল।

উৎসুক শ্রোতাদের কাছে ক্যারলের কীর্তি বর্ণনা করে শোনাল অর্ক। এরপর জোর হাততালি আর বাহবা ধ্বনিতে অভিনন্দিত হতে লাগল ক্যারল।

প্রখর সূর্যালোকের ভেতর দিয়ে ওরা গিয়ে ঢুকে পড়ল তাঁবুতে। আজ তাপ কত সেলসিয়াসে উঠেছে কে জানে। বাতাসও যেন থমকে আছে।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে অর্ক আর ক্যারল তাঁবুর ভেতর

শুয়ে শুয়ে গল্প করতে লাগল। রত্নাবলী আর তিনুনি গেল গাছতলায় তপ্ত দুপুরের বিশ্রাম আর আলাপের জন্য।

সন্ধ্যায় ওরা বিপাশার তীরে তীরে ঘুরে বেড়াল। গান গাইল, লোক-সংগীত। এ ব্যাপারে প্রধান শিল্পী তিনুনি। কুলু কাংড়ার অনেক লোক-সংগীত ওর জানা। দশেরা উৎসবে কুলুর ঢোল ময়দানে যে সব লোক-সংগীত শিল্পী অনুষ্ঠান করে তাদের গানের কথা আর সুর ওর কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। প্রতি বছর দশেরা উৎসবে ওরা চলে আসে মানালী থেকে কুলুর বাড়িতে। দশেরার আনন্দ অনুষ্ঠানে ওদের যোগ দেওয়া চাই-ই-চাই। লোক নৃত্যের ঢংগুলিও দীর্ঘদিন দেখার ফলে ওর আয়ত্তে এসে গেছে। এইসব নিয়ে তিনুনির ভেতর জেগে উঠেছে এক জাত শিল্পীর প্রতিভা।

এই সন্ধ্যায় তিনুনি আর রত্নাবলী নাচে আর গানে বিপাশার কূল মুখর করে তুলল।

তাঁবুতে ফেরার পথে ওরা অনুভব করল, হাওয়া যেন একটুও বইছে না। সন্ধ্যার স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

আর একটা দৃশ্য ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সন্ধ্যার আকাশ ছেয়ে শত শত পাখি উড়ে চলেছে।

ভ্যালির ওপরের আকাশ দিয়ে সন্ধ্যায় পাখি উড়ে যায়, এ দৃশ্য কোন নতুন নয়। কিন্তু এই ঝাঁক ঝাঁক পাখির দ্রুত পাখা টেনে চলার দৃশ্য আগে কখনো এদের চোখে পড়েনি।

অর্ক বলল, ফরেস্টে আগুন লাগলে পাখিরা এমনিভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখা টেনে উড়ে পালায়।

রত্নাবলী বলল, তোমার কথা হয়ত ঠিক। খুব কাছে কোন পাহাড়ী বনে আগুন লাগতে পারে।

তিনুনি বলল, নিচের ভ্যালিতে অনেক আগে ফসল তোলা হয়ে গেছে, কিন্তু আপার ভ্যালিতে কোন কোন জায়গায় দেরীতে ফসল ওঠে। হয়ত বাবেলি, রাইসন, নাগুগর, কাতরাইন ভ্যালিগুলোতে ফসল উঠতে এ বছর দেরী হয়েছে। তাই ফসলের ক্ষেতগুলো থেকে শস্যদানা খেয়ে ওদের এমনি করে উড়ে আসতে দেখা যাচ্ছে।

ক্যারল শুধু একটি মন্তব্য করল, প্রকৃতির খেয়ালে কত কি

যে ঘটে চলেছে, তার কতটুকুই বা আমরা বুঝি আর জানি।

শেষ পর্যন্ত ক্যারলের কথাই সত্যে পরিণত হল। রাত্রি প্রায় দুটোয় ওরা যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন অন্ধবেগে ধেয়ে এল প্রচণ্ড একটা দানব।

হাল ভাঙা, পাল ছেঁড়া নৌকোর মত সমস্ত তাঁবুটা যেন খুঁটির বাঁধন ছিড়ে উড়ে যেতে চাইল।

রত্নাবলীর ঘুম আগে ভাঙল। সে পাশে শুয়ে থাকা অর্ককে ঝাঁকি দিয়ে বলল, শোন শোন, বাইরে কি যেন একটা দাপাদাপি করছে।

অর্ক উঠে পড়ে শোনার চেষ্টা করল। তাই তো।

সে ব্যাপারটা বোঝার জন্য বেরুবার চেষ্টা করতেই তার হাতখানা চেপে ধরল রত্নাবলী।

শুনতে পাচ্ছ না, ভয়ংকর গর্জন করছে।

ততক্ষণে ওরা বুঝতে পারল, কিছু একটা ঝাঁকি দিয়ে টেন্টটাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

তিনুনি জেগে উঠেই আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, বাইরে কারা শব্দ করছে। অনেকগুলোতে মিলে একটানা গোঁগানির শব্দ।

ক্যারল জেগে উঠে এক মুহূর্ত কান পেতে বলল, ঝড়! প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইছে।

ও সামান্য একটুখানি পর্দা খুলে বাইরে মুখ বাড়াতেই ঝড়ের ঝাপটায় তাঁবুর ভেতর ছিটকে পড়ল। টুকিটাকি জিনিসপত্রগুলো হাওয়ার দাপটে আর্ত কোলাহল জুড়ে দিল।

ওরা দু'তিনজন মিলে চাপাচাপি করে বন্ধ করল পর্দার ফাঁকটুকু।

এবার মুষলধারে শিলাবৃষ্টি শুরু হল।

মনে হতে লাগল তাঁবুর পর্দা যে কোন মুহূর্তে ফেটে যাবে।

প্রাণফাটা কান্না শুরু হয়েছে পাইন বনে। কয়েকটা ছোটখাটো ডাল ঝড়ের ঝাপটায় ছিটকে এসে পড়ছে তাঁবুর ওপর।

'মেঘ ডেকে উঠল। পাহাড়ে পাহাড়ে কি ভয়ংকর তার প্রতিধ্বনি। মেঘ ডাকছে তো প্রতিধ্বনি উঠছে। মনে হচ্ছে,

এরিণার ভেতর দাঁড়িয়ে কাঁপছে নিরস্ত্র কয়েকটি মানুষ। চারদিকে লোহার খাঁচায় বন্দী অভুক্ত কটা সিংহ। তারা সামনে খাবার দেখে সমানে গর্জন করে চলেছে। ছেড়ে দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে অসহায় মানুষগুলোকে।

অর্ক বলল, এখন কি করব আমরা ?

ক্যারল বলল, আপাততঃ চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায় কি ? এখন বেরিয়ে পুল পার হয়ে সরকারি বাংলোর দিকে যেতে গেলেই সমূহ বিপদ। ঘূর্ণি ঝড়ের মুখে পড়ে বিপাশার স্রোতে ভেসে যেতে হবে।

কথা শেষ হতে না হতেই ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ ভাঙার শব্দ হল। জলের ছিঁটে ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভেতর।

টর্চ ফেলল ক্যারল। বিপাশার ছোবল তাঁবুর ভেতর অব্দি এসে পড়েছে। না জানি তাঁবুর মধ্যে বসে থাকলে কি বিপর্যয় ঘটে যায়।

ঘন ঘন কয়েকটা বাজ পড়ল। বিদ্যুতের ঝলকানি তাঁবুর ভেতর বসেও কিছুটা দেখতে পেল ওরা। মনে হল, বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন হুড়মুড় করে পাহাড় ভেঙে পড়ল।

ক্যারল বলল, তোমরা বসে থাক আমি বাইরের অবস্থাটা একবার দেখে আসছি।

তিনুনি কান্নার গলায় চেঁচিয়ে উঠল, এ দুর্যোগে তুমি বাইরে একেবারেই যাবে না।

পাগলামি কর না তিনুনি। একটু পরেই মনে হচ্ছে বিপাশা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সরকারি বাংলোর দিকটা পাথর আর মাটি ফেলে উঁচু করা আছে। ওটাকে সহজে টপকে যেতে পারবে না বিপাশা। আমি টর্চ ফেলে দেখে আসছি, এ বিপদ থেকে বেরুনো যাবে কিনা।

তিনুনি জেদ ধরল, তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।

অর্ক বলল, তোমাকে যেতে হবে না, দরকার হলে আমিই যাব সঙ্গে।

তিনুনি বলল, তুমি কেন যাবে ভাই, রত্নাবলীর কাছে তাঁবুতে

একজন ছেলের অন্তত থাকা দরকার।

ক্যারলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল তিনুনি। এই মুহূর্তে প্রবল দুর্যোগের ভেতরেও ক্যারল নিজেকে ভারি হাল্কা আর মুক্ত মনে করল। যে পাষাণভারটা এ ক'দিন সে বয়ে বেড়াচ্ছিল সেটা সহসা নেমে গেল তার মনের উপর থেকে। সে অনুভব করল, তার বুকে বিঁধে থাকা তীক্ষ্ম কাঁটাটা এখন আর তাকে একটুও যন্ত্রণা দিচ্ছে না। সেটা আছে কি খসে পড়েছে তা সে একেবারেই বুঝতে পারল না।

আকাশ ভেঙে এখন ওদের মাথার ওপর বৃষ্টি পড়ছে। টর্চের আলো জ্বালার একটুও দরকার হল না। ঘন ঘন তীব্র বিদ্যুতের চমকে চরাচর দৃশ্যমান।

বিপাশার জল স্ফীত হয়ে ফুঁসে উঠেছে। ব্রীজের কাছে গিয়ে দেখল, পাটাতন ছুঁতে জলের আর খুব বেশী বাকী নেই।

স্রোতের মত জল গড়াচ্ছে ওদের গা বেয়ে।

ব্রীজের কাছে এসে ক্যারল বলল, তুমি এখানে একটুখানি দাঁড়াও, আমি ব্রীজের ওপর উঠে অবস্থাটা দেখে আসি।

ব্রীজের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ক্যারল ওপ্রান্তে টর্চ ফেলল।

সর্বনাশ! জীর্ণ কাঠের সেতুর ওদিককার অংশ খানিকটা জলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তীরের কাছাকাছি যে শিলাখণ্ডটি মাথা উঁচু করে মৈনাকের মত দাঁড়িয়েছিল সেটি জলের তলায় মাথা ডুবিয়েছে।

এরপর বেশী দেরী হলে ব্রীজ পার হবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ক্যারল চেঁচিয়ে বলল, ওদের নিয়ে তাড়াতাড়ি এখানে চলে এসো। সঙ্গে কিছুছু আনতে হবে না। নিজেরা প্রাণে বাঁচতে পারলেই যথেষ্ট।

বিদ্যুতের আলোয় পথ দেখতে দেখতে তিনুনি তাঁবুর কাছে গিয়ে পেঁছিল।

বাইরে বেরিয়ে এসো চটপট, কোন কিছু নিতে হবে না সঙ্গে।

ওরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে তিনুনির সঙ্গে ছুটতে লাগল ব্রীজের দিকে।

ততক্ষণে পুলের একটা প্রান্তের কাঠ ধরে কোমর জলে ডুবন্ত

শিলার ওপর নেমে পড়েছে ক্যারল। নামার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, কোমর থেকে নিচের অংশটুকু হাঙরে কেটে নিল। চিমটি কাটলেও সাড়া পাওয়া যাবে না।

ওরা কাছে আসতেই ক্যারল চেঁচিয়ে বলল, ব্রীজের মুখটা জলে পড়ে গেছে, প্রবল স্রোত বইছে ওর ওপর দিয়ে, ওদিক থেকে পেরোবার চেষ্টা কর না। আমার কাঁধের ওপর পা রেখে লাফ দাও। তিন ফুটের বেশী হবে না। আগে অর্ক এসো। তিনুনি তোমাদের পায়ের কাছে টর্চ আছে, ডাঙায় আলো ফেল।

অর্ক ক্যারলের কাঁধে পা রেখে লাফ দিয়ে ডাঙায় চলে গেল।

রত্নাবলীও সজোরে লাফ দিল। অর্ক দুহাত বাড়িয়ে লুফে নিল তাকে।

ক্যারল বলল, তোমরা দুজনে ছুটে গিয়ে চৌকিদারকে জাগাও। আমি আজ সারাদিন ওখান থেকে কোন ট্যুরিস্টকে বেরোতে দেখিনি। অনুমান, কেউ আসেনি।

ওরা ছুটল বিদ্যুতের আলোয় পথ চিনে।

দাঁতে দাঁত চেপে কাঁপুনি বন্ধ করেছে ক্যারল। সে আর তিনুনিকে কারু বুকের ওপর আছড়ে পড়তে দেবে না।

আমাকে টর্চ দাও।

টর্চ হাতে নিয়ে জ্বলন্ত অবস্থায় রেখে তাকে ছুঁড়ে দিল ডাঙায়। টর্চটা তেমনি জ্বলতে লাগল।

এসো আমার কাঁধের ওপর।

তিনুনি কাঁধে উঠে দাঁড়াতেই ক্যারল বলল, কোন ভয় নেই, লাফ দাও।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্যারল দুহাতের প্রবল শক্তিতে তিনুনিকে যেন ঢেলার মত ছুঁড়ে দিল তীরে।

এতক্ষণ বাঁহাতে ব্রীজের একটা কাঠ ধরে ব্যালান্স রাখছিল ক্যারল, এবার দুহাতে তিনুনিকে ছুঁড়ে দিতে গিয়ে সে তার পায়ের ভারসাম্য হারাল। সঙ্গে সঙ্গে বিপাশার প্রবল স্রোত তাকে ব্রীজের তলায় টেনে নিল। বুকফাটা চিৎকার করে উঠল তিনুনি। সে টর্চের আলো ফেলে আকুল হয়ে ডাকতে লাগল ক্যারলকে। তার হাহাকার মেঘের গর্জনে, বৃষ্টির শব্দে মিশে গেল।

হঠাৎ তিনুনির টর্চের আলো এসে পড়ল ব্রীজের তলায়।

ঐ তো ক্যারল !

সে স্লিপ্ করে স্রোতে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলেছিল ডুবে যাওয়া ব্রীজের একটা অংশ। তাই ধরে বরফ শীতল জল থেকে সে অনেক লড়াই করতে করতে তিন্নির ছুঁড়ে দেওয়া দোপাট্টার একটা প্রান্ত ধরে ডাঙায় উঠে এল।

ক্যারল একেবারে নিঃশেষিত। তিন্নির কাঁধে ভর রেখে সে দেহটাকে কোনরকমে টানতে টানতে এনে ফেলল সরকারী বাংলোতে।

ফাঁকা বাংলোর দুখানা ঘর চৌকিদার তাদের দিয়ে দিল।

বাথরুমে নতুন তোয়ালে, গীজারে গরম জল। দুখানা রুমে দুটি করে বেড আর একটি করে রুম হিটার।

রত্নাবলী ঠাণ্ডায় বড় বেশী কাবু হয়ে পড়েছিল। তিন্নি বলল, অর্ক তুমি ওকে একটু দেখো, আমি ক্যারলকে দেখছি।

ভেজা পোশাক ছেড়ে গরম জলে গা ধুয়ে তোয়ালেতে সারা দেহ মুছে নিল ওরা। তারপর বিছানা থেকে এক একখানা ধোয়া চাদর টেনে নিয়ে সর্বাঙ্গ জড়াল।

রুম হিটার জেবলে দিতেই উত্তাপে ভরে উঠল ঘর।

এখন ঘরের আলো নিভে গেছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ার শব্দ মৃদু হয়ে এসেছে।

রুম হিটারের লাল আলোয় দাঁড়িয়ে আছে এক রহস্যময়ী তরুণী।

ক্লান্ত ক্যারল তার বিছানা থেকে ডাক দিল, তুমি আজও কি আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে? মৃত্যুর মুখ থেকে তুমিই তো আমাকে কূলে টেনে তুললে।

পাগলের মত ছুটে গিয়ে ক্যারলের বুকে আছড়ে পড়ল তিন্নি। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তার অভিমানের অশ্রু ঝরাতে লাগল ক্যারলের প্রশস্ত বুকের ওপর।

ক্যারল তাকে জড়িয়ে ধরল অনুরাগে, আশ্লেষে।

ভোরবেলা দেখা গেল বন্ধ জানালার কোন্ রন্ধ্র পথে একটি প্রজাপতি ঢুকে পড়েছে। সে খেলা করছে এক ঘুমন্ত তরুণীর কপোলে।

মনে হচ্ছে সে তরুণী একটি আপেল বৃক্ষ। প্রথম দুটি সোনালী আপেল ফলেছে তার অঙ্গে। সেই দুটি গোল্ডেন অ্যাপ্‌ল স্পর্শ করে আছে এক ঘুমন্ত যুবরাজের দশটি শুভ্র সতেজ অঙ্গুলি।